সাংবাদিকতায় নজরুল

কমরেড মুজাফ্ফর আহমদ নজরুলের সাংবাদিকতার পরিচয় দিয়েছেন তাঁর গ্রন্থে। নি:সন্দেহে একজন কবি সৈনিক অথবা সৈনিক কবি, যেভাবেই নজরুলকে আমরা দেখি না কেন, নজরুল সমকালে একজন সফল সাংবাদিক হয়েছিলেন এটা নি:সন্দেহে বিস্ময়কর। কারণ জীবনে তিনি কখনও সাংবাদিকতার পেশা গ্রহণ করেননি। একজন কবি হিসেবেই তার পরিচয়। এই কবি পরিচয় এবং সংবাদপত্রে সংবাদ শিরোনামে কাব্যের সাংবাদিকতা তাঁকে সে সময় জনপ্রিয় করে তুলেছিল। এমনকি যে আকরাম খাঁ তাঁকে দু'চোখে দেখতে পারেন নি তিনি তাঁর 'সেবক' পত্রিকার কাটতির জন্য নজরুলের শরণাপন্ন হয়েছিলেন এবং নজরুল সাংবাদিক হিসেবে ' সেবক' পত্রিকায় যোগদানও করেছিলেন।

নজরুল সাংবাদিক হিসেবে তাঁর সমকালে পেশাদার সাংবাদিকদের থেকে বেশী স্বীকৃতি পেয়েছিলেন তার নিজস্ব পত্রিকা 'ধুমকেতু'র জন্যে। এই পত্রিকা প্রকাশের পেছনে একজন কোরআনে 'হাফেজ' এবং দেওবন্দ মাদ্রাসার ছাত্র হাফিজ মাসউদ আহমদের নাম জড়িয়ে আছে। সে সময় ভারতের দেওবন্দ মাদ্রাসা এবং সাহারানপুর মাদ্রাসার ছাত্রেরা বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। হাফিজ মসউদ আহমদ চট্টগ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি প্রথমে কমরেড মুজাফ্ফর আহমদকে একটা সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা প্রকাশের জন্য প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তিনি পুরো কাগজটাকে রাজনীতিক কাগজ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর হাতে তেমন টাকা না থাকায় মুজাফ্ফর আহমদ তা নাকচ করে দেন। অত:পর হাফিজ মসউদ আহমদ নজরুলের শরণাপন্ন হন এবং নজরুল সানন্দে তার প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

নজরুল তখন আকরাম খাঁ সাহেবের 'সেবক' পত্রিকায় চাকুরী করতেন। আকরাম খাঁ সাহেবকে নজরুল পছন্দ করতেন না। ফলে মসউদ সাহেবের প্রস্তাবে রাজী হয়ে তিনি নিজেই পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। 'ধুমকেতু' প্রকাশে নজরুলের বন্ধু-বান্ধবেরা তাঁকে সহযোগিতা করেছিলেন।

'এক্সপার্ট এডভারটাইজিং এজেন্সী' বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নজরুলকে সহায়তা দিয়েছিল। নজরলের বলিষ্ঠ লেখনির কারণে 'ধুমকেতু' দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করে। এই পত্রিকার মাধ্যমে নজরুল ভারতের স্বাধীনতা দাবী করেছিলেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে

বিপ্লবীরা যোগ দিয়েছিলেন। এক সময়ের তুখোড় বিপ্লবী এবং কংগ্রেসের নেতা ভূপতি মজুমদার নজরুলকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেন– অর্থ বিদ্যা নয়, অন্যান্য ভাবে। তিনি দু'বার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী হয়েছিলেন। বিপ্লবী বীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত সেদিন নজরুলের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। নজরুলের লেখা, সংবাদ পরিবেশন সবই ছিল ইংরেজদের বিরুদ্ধে। প্রকাশের সাথে সাথেই 'ধুমকেতু'র সংবাদপত্র নি:শোধিত হয়ে যেত। 'ধুমকেতু'র জনপ্রিয়তা এবং ইংরেজ বিরোধী হওয়ায় পত্রিকাটি বন্ধের জন্য ইংরেজ সরকার ওঠে-পড়ে লাগে এবং নজরুলকে গ্রেফতার করে। এ সময় নজরুল অনশন শুরু করেন। রবীন্দ্রনাথ অনশন ভঙ্গের জন্য নজরুলকে টেলিগ্রাম করেন। কিন্তু তা নজরুলের হাতে পৌঁছেছিল না। এ সময় আদালতে দেওয়া নজরুলের 'রাজবন্দীর জবানবন্দি" হিন্দু-মুসলমান সকলের মনকে দারুণ ভাবে প্রভাবিত করে তোলে। এই জনাববন্দি একজন কবির হলেও তা ছিল গোটা ভারতবাসীর হৃদয়ের বাণী। অসাধারণ শক্তিশালী ছিল 'রাজবন্দির জবানবন্দি'র ভাব এবং ভাষা। সর্বকালের শ্রেষ্ঠ জবানবন্দির অন্যতম ছিল এটি। আদালতে প্রদত্ত নজরুলের এই জবানবন্দী সমগ্র দেশের রাজনৈতিক চেতনার ইতিহাসে এক অসাধারণ গৌরবজনক স্থান অধিকার করে আছে। নজরুল কবি ছিলেন এবং তাঁর লেখার জন্যে তিনি বিভিন্ন সময়ে জেলেই শুধু নয়, জেলের বাইরেও নানাভাবেই তিনি নির্যাতিত হয়েছেন। তাঁর এই জবানবন্ধিটি ছিল এক অনুপম সাহিত্য এবং তা অনবদ্ধ। সেদিন নজরুল ছিলেন ভারতের স্বাধীনতার মূর্ত প্রতীক। পৃথিবীর ইতিহাসে দেশের জন্য, জাতির জন্য কোন কবিকে এমন অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হয়নি। কিন্তু দুর্ভাগ্য, ভারত এবং পাকিস্তানের স্বাধীনতায় নজরুলের নাম স্বাধীনতাকামীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। দেশের জন্য কলমের মাধ্যমে এমন জীবনপণ লড়াই অন্য কোন কবি করেন নি। রবীন্দ্রনাথ স্বাধীনতার জন্য তেমন কোন ভূমিকা না রেখেও ভারতীয়দের কাছে জাতিগতভাবে সম্মানিত হয়েছেন। কিন্তু যে কবি প্রতিনিয়ত তাঁর লেখনির মাধ্যমে এদেশের আপামর জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করে গেলেন, স্বাধীনতার পরে রাষ্ট্রের দায়িত্বে যাঁরা ছিলেন তাঁরা তাঁকে ভুলে গেলেন। পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা হিসেবে ইকবালের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকে অথচ যে মানুষটি শুধু ইংরেজদের বিরুদ্ধেই নয়, সকল অত্যাচারী এবং শোষকদের বিরুদ্ধে আজীবন লড়াই করে গেলেন। সুভাষচন্দ্র বসু যাঁকে স্বাধীনতার মূর্ত প্রতীক হিসেবে গণ্য করলেন, তাঁকে রাজনীতিকভাবে যেমন প্রদমিত করা হয়েছে, একশ্রেণীর সাহত্যিকেরাও তাঁকে কদর্যভাষায় আক্রমণ করেছেন। সাহিত্য এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে নজরুল যে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন করেছিলেন, যার জন্য তাঁর 'বিষের বাঁশি' বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল, শুধু তাই-ই নয়, 'ধুমকেতু' তে তাঁর প্রকাশিত লেখার জন্য তিনি বৃটিশরাজ্যে কোষানলে পড়েছিলেন। 'ধুমকেতু'র ১৫শ সংখ্যায় 'বিদ্রোহীর কৈফিয়ৎ' প্রকাশের পর ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ নভেম্বর বেলা ১২টায় পুলিশ তাঁকে কুমিল্লা থেকে গ্রেফতার করে। ২৫ নভেম্বর তাঁকে কোর্টে হাজির করা হয়। মোকদ্দমার দিন পড়ে ২৯ নভেম্বর ১৯২২।

কলকাতার তদানীন্তন চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট মি: সুইনহোর আদালতে নজরুলের বিচার হয়। ১৯২৩ সালের ১৬ জানুয়ারী সাউদার্ন ডিভিশন পোলিস কোর্টে সুইনহো মামলার রায় দেন। রাজদ্রোহের অপরাধে নজরুলের এক বৎসর জেল হয়।

অবশ্য রায়দেবার পূর্বেই নজরুল রাজবন্দীর জবানবন্দি রচনা করেন। তারিখ ৭ জানুয়ারী ১৯২৩। লেখার স্থান প্রেসিডেন্সি জেল। নজরুলের বিরুদ্ধে 'ধুমকেতু'র মামলায় এই জবানবন্ধি আদালতে দাখিল করা হয়েছিল। ২৭ জানুয়ারী ১৯২৩ ১৩ই মাঘ ১৩২৯ 'ধুমকেতুর' নজরুল সংখ্যা হিসেবে জবানবন্দিটি প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার 'রাজবন্দীর জবানবন্দী'র সঙ্গে নজরুলের একটি ছবি এবং 'ধুমকেতু'র গ্রহণ শিরোনামে দণ্ডাদেশের সংবাদ লেখা হয়। অত:পর 'ধুমকেতু' পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।

জানা যায়, নজরুলের কারাদণ্ডাদেশদাতা চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মি: সুইন হো নিজেও কবি ছিলেন। নজরুলের 'রাজবন্ধীর জবানবন্দী' তিনি হয়তো পড়েছিলেন, কিন্তু বৃটিশ রাজের বিপক্ষে হয়তো তাঁর কিছুই করার ছিল না। এ সময়ে নজরুল প্রেসিডেন্সী জেল থেকে আলিপুর জেলে স্থানান্তরিত হন। সে সময় আলিপুর জেলে শিবপুর ডাকাতির নায়ক নরেন ঘোষ চৌধুরী, নরেন্দ্রনাথ রায় চক্রবর্তী, জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, মাওলানা সুফী মঞ্জুর আলম, আফসার উদ্দীন প্রমুখ ব্যক্তিগণ নজরুলের সঙ্গে আলিপুর জেলে ছিলেন। সে সময় মলিন মুখোপাধ্যায় নজরুলের পক্ষে বিনা পারিশ্রমিকে উকিল হিসেবে কাজ করেন।

২৭ জানুয়ারী ১৯২৩ নজরুলের 'রাজবন্দীর জবানবন্ধী' পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয় এবং তার দু'টি সংকলনও এ সময় প্রকাশিত হয়েছিল। এতে বোঝা যায় যে নজরুল কত জনপ্রিয় ছিলেন তাঁর সমকালে। এই নিবন্ধে নজরুলের 'রাজবন্দীর জবানবন্ধী' সংযুক্ত করা হয়েছে।

রাজবন্দীর জবানবন্ধী

আমার উপর অভিযোগ, আমি রাজবিদ্রোহী। তাই আমি আজ রাজকারাগারে বন্দী এবং রাজদ্বারে অভিযুক্ত।

এ ধারে রাজার মুকুট; আর ধারে ধুমকেতুর শিখা। একজন রাজা, হাতে রাজদণ্ড; আর জন সত্য, হাতে ন্যায়দণ্ড। রাজার পক্ষে – নিযুক্ত রাজবেতনভোগী রাজকর্মচারী। আমার পক্ষে– সকল রাজার রাজা, সকল বিচারকের বিচারক, আদি অন্তকাল ধরে সত্য– জাগ্রত ভগবান।

আমার বিচারককে কেহ নিযুক্ত করে নাই। এ-মহাবিচারকের দৃষ্টিতে রাজা-প্রজা, ধনী-নির্ধন, সুখী-দুঃখী সকলে সমান। এঁর সিংহাসনে রাজার মুকুট আর ভিখারির একতারা পাশাপাশি স্থান পায়। এঁর আইন– ন্যায়, ধর্ম। সে-আইন কোন বিজেতা মানব

কোন বিজিত বিশিষ্ট জাতির জন্য তৈর করে নাই। সে-আইন বিশ্ব-মানবের সত্য উপলব্ধি হতে সৃষ্ট; সে-আইন সার্বজনীন সত্যের, সে-আইন সার্বভৌমিক ভগবানের। রাজার পক্ষে– পরমাণু পরিমাণ খণ্ড-সৃষ্টি; আমার পক্ষে– আদি অন্তহীন অখণ্ড স্রষ্টা।

রাজার পেছনে ক্ষুদ্র, আমার পেছনে– রুদ্র। রাজার পক্ষে যিনি, তাঁর লক্ষ্য স্বার্থ, লাভ অর্থ; আমার পক্ষে যিনি তাঁর লক্ষ্য সত্য, লাভ পরমানন্দ।

রাজার বাণী বুদ্বুদ, আমার বাণী সীমাহারা সমুদ্র। আমি কবি, অপ্রকাশ সত্যকে প্রকাশ করবার জন্য, অমূর্ত সৃষ্টিকে মূর্তি দানের জন্য ভগবান কর্তৃক প্রেরিত। কবির কণ্ঠে ভগবান সাড়া দেন। আমার বাণী সত্যের প্রকাশিকা, ভগবানের বাণী। সে-বাণী রাজবিচারে রাজদ্রোহী হতে পারে, কিন্তু ন্যায় বিচারে সে-বাণী ন্যায়-দ্রোহ নয়, সত্য-দ্রোহী নয়। সে-বাণী রাজদ্বারে দণ্ডিত হতে পারে, কিন্তু ধর্মের আলোকে, ন্যায়ের দুয়ারে তাহা নিরপরাধ, নিষ্কলুষ, অম্লান, অনির্বাণ সত্য-স্বরূপ।

সত্য স্বয়ংপ্রকাশ। তাহাকে কোনো রক্ত-আঁখি রাজ-দণ্ড নিরোধ করতে পারে না। আমি সেই চিরন্তন স্বয়ম-প্রকাশের বীণা, যে-বীণায় চির-সত্যের বাণী ধ্বনিত হয়েছিল। আমি ভগবানের হাতের বীণা। বীণা ভাঙলেও ভাঙ্গতে পারে, কিন্তু ভগবানকে ভাঙ্গবে কে? একথা ধ্রুব সত্য যে, সত্য আছে, ভগবান আছেন– চিরকাল ধরে আছে এবং চিরকাল ধরে থাকবে। যে আজ সত্যের বাণী রুদ্ধ করছে, সত্যের বাণীকে মুক করতে চাচ্ছে, সেও তাঁরই এক ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সৃষ্টি অণু। তাঁরই ইঙ্গিত-আভাসে, ইচ্ছায় সে আজ আছে, কাল হয়ত থাকবে না। নির্বোধ মানুষের অহঙ্কারের আর অন্ত নাই; সে যাহার সৃষ্টি, তাহাকেই সে বন্দী করতে চায়, শাস্তি দিতে চায়। কিন্তু অহঙ্কার একদিন চোখের জলে ডুববেই ডুববে।

যাক, আমি বলছিলাম, আমি সত্য প্রকাশের যন্ত্র। সে-যন্ত্রকে অপর কোনো নির্মম শক্তি অবরুদ্ধ করলেও করতে পারে, ধ্বংস করলেও করতে পারে; কিন্তু সে-যন্ত্রে যিনি বাজান, সে- বীণায় যিনি রুদ্র-বাণী ফোটান, তাঁকে অবরুদ্ধ করবে কে? সে বিধাতাকে বিনাশ করবে কে? আমি মরব, কিন্তু আমার বিধাতা অমর। আমি মরব, রাজাও মরবে, কেননা আমার মতন অনেক রাজবিদ্রোহী মরেছে, আর এমনি অভিযোগ আনয়নকারী বহু রাজাও মরেছে, কিন্তু কোনকালে কোন কারণেই সত্যের প্রকাশ নিরুদ্ধ হয় নি– তার বাণী মরেনি। সে আজও তেমনি ক'রে নিজেকে প্রকাশ করছে এবং চিরকাল ধরে করবে। আমার এই শাসন নিরুদ্ধ বাণী আবার অন্যের কণ্ঠে ফুটে উঠবে। আমার হাতের বাঁশি কেড়ে নিলেই সে বাঁশির সুরের মৃত্যু হবে না; কেননা আমি আর এক বাঁশি নিয়ে বা তৈরি করে তাতে সুর ফোটাতে পারি। সুর আমার বাঁশির নয়, সুর আমার মনে এবং আমার বাঁশি সৃষ্টির কৌশলে। অতএব দোষ বাঁশিরও সয় সুরেরও নয়; দোষ আমার, যে বাজায়, তেমনি যে বাণী আমার কণ্ঠ দিয়ে নির্গত হয়েছে, তার জন্য দায়ী আমি নই। দোষ আমারও নয়, আমার বীণারও নয়; দোষ তাঁর যিনি আমার কণ্ঠে তাঁর বীণা বাজান। সুতরাং রাজবিদ্রোহী আমি নই; প্রধান রাজবিদ্রোহী সেই বীণা-বাদক ভগবান।

তাঁকে শাস্তি দিবার মত রাজ-শক্তি বা দ্বিতীয় ভগবান নেই। তাঁহাকে বন্দী করবার মত পুলিশ বা কারাগার আজও সৃষ্টি হয় নাই।

রাজার নিযুক্ত রাজ-অনুবাদক রাজভাষায় সে-বাণীর শুধু ভাষাকে অনুবাদ করেছে, তাঁর প্রাণকে অনুবাদ করেনি। তার অনুবাদে রাজ-বিদ্রোহ ফুটে উঠেছে, কেননা তার উদ্দেশ্যে রাজাকে সন্তুষ্ট করা, আর আমার লেখায় ফুটে উঠেছে সত্য, তেজ আজ প্রাণ। কেননা আমার উদ্দেশ্য ভগবানকে পূজা করা; উৎপীড়িত আর্ত বিশ্বাসীর পক্ষে আমি সত্য তরবারি, ভগবানের আঁখিজল। আমি রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করি নাই, অন্যায়ের বিরুদ্ধ বিদ্রোহ করেছি।

আমি জানি এবং দেখেছি– আজ এই আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় একা আমি দাঁড়িয়ে নেই, আমার পশ্চাতে স্বয়ং সত্যসুন্দর ভগবানও দাঁড়িয়ে। যুগে যুগে তিনি এমনি নীরবে তাঁর রাজবন্দী সত্য–সৈনিকের পশ্চাতে এসে দণ্ডায়মান হন। রাজনিযুক্ত বিচারক সত্য বিচারক হতে পারে না। এমনি বিচার-প্রহসন করে যেদিন খ্রিষ্টকে ক্রুশে বিদ্ধ করা হল, গান্ধীকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হল, সেদিনও ভগবান এমনি নীরবে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের পশ্চাতে। বিচারক কিন্তু তাঁকে দেখতে পায়নি, তার আর ভগবানের মধ্যে তখন সম্রাট দাঁড়িয়েছিলেন, সম্রাটের ভয় তার বিবেক, তার দৃষ্টি অন্ধ হয়ে গেছিল। নইলে সে তার ঐ বিচারাসনে ভয়ে বিস্ময়ে থরথর করে কেঁপে উঠত, নীল হয়ে যেত, তার বিচারাসন সমেত সে পুড়ে ছাই হয়ে যেত।

বিচারক জানে আমি যা বলেছি, যা লিখেছি তা ভগবানের চোখে অন্যায় নয়, ন্যায়ের এজলাসে মিথ্যা নয়। কিন্তু তবু হয়ত সে শাস্তি দেবে, কেননা সে সত্যের নয়, সে রাজার। সে ন্যায়ের নয়, সে আইনের। সে স্বাধীন নয়, সে রাজভৃত্য।

তবু জিজ্ঞাসা করছি– এই যে বিচারাসন – এ কার? রাজার, না ধর্মের? এই যে বিচারক, এর বিচারের জবাবদিহি করতে হয় রাজাকে, না তার অন্তরের আসনে প্রতিষ্ঠিত বিবেককে, সত্যকে, ভগবানকে? এই বিচারককে কে পুরস্কৃত করে? রাজা না ভগবান? অর্থ না আত্মপ্রসাদ?

শুনেছি, আমার বিচারক একজন কবি। শুনে আনন্দিত হয়েছি। বিদ্রোহী কবির বিচার বিচারক কবির নিকট। কিন্তু বেলাশেষের শেষ–খেয়া এ প্রবীণ বিচারককে হাতছানি দিচ্ছে, আর রক্ত-উষার নব-শঙ্খ আমার অনাগত বিপুলতাকে অভ্যর্থনা কচ্ছে; তাকে ডাকছে মরণ, আমায় ডাকছে জীবন; তাই আমাদের উভয়ের অস্ত-তারা আর উদয়-তারার মিলন হবে কিনা বলতে পারি না। না, আবার বাজে কথা বললাম।

আজ ভারত পরাধীন। তার অধিবাসীবৃন্দ দাস। এটা নির্জলা সত্য। কিন্তু দাসকে দাস বললে, অন্যায়কে অন্যায় বললে এ রাজত্বে তা হবে রাজদ্রোহ। এ তো ন্যায়ের শাসন হতে পারে না। এই যে জোর করে সত্যকে মিথ্যা, অন্যায়কে ন্যায়, দিনকে রাত বলানো– একি সত্য সহ্য করতে পারে? এ শাসন কি চিরস্থায়ী হতে পারে? এতদিন

হয়েছিল, হয়ত সত্য উদাসীন ছিল বলে। কিন্তু আজ সত্য জেগেছে, তা চক্ষুষ্মান জাগ্রত– আত্মা মাত্রই বিশেষরূপে জানতে পেরেছে। এই অন্যায় শাসন-ক্লিষ্ট বন্দী সত্যের পীড়িত ক্রন্দন আমার কণ্ঠে ফুটে উঠেছিল বলেই কি আমি রাজদ্রোহী? এ ক্রন্দন কি একা আমার? না– এ আমার কণ্ঠে ঐ উৎপীড়িত নিখিল-নীরব সম্মিলিত সরব প্রকাশ? আমি জানি, আমার কণ্ঠের ঐ প্রলয় হুংকার একা আমা রনয়, সে যে নিখিল আত্মার যন্ত্রণা-চিৎকার। আমায় ভয় দেখিয়ে মেরে এ ক্রন্দন থামানো যাবে না। হঠাৎ কখন আমার কণ্ঠের এই হারাবাণীই তাদের আরেক জনের কণ্ঠে গর্জন করে উঠবে।

আজ ভারত পরাধীন না হয়ে যদি ইংলন্ডই ভারতের অধীন হত এবং নিরস্ত্রীকৃত উৎপীড়িত ইংলন্ড-অধিবাসীবৃন্দ স্বীয় জন্মভূমি উদ্ধার করবার জন্য বর্তমান ভারতবাসীর মত অধীর হয়ে উঠত, আর ঠিক সেই সময় আমি হতুম এমনি বিচারক এবং আমার মতই রাজদ্রোহ অপারাধে ধৃত হয়ে এই বিচারক আমার সম্মুখে বিচারার্থ নীত হতেন, তহেলে সে সময় এই বিচাররক আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যা বলতেন, আমিও তাই এবং তেমনি করেই বলছি।

আমি পরম আত্মবিশ্বাসী। তাই যা অন্যায় বলে বুঝেছি, তাকে অন্যায় বলেছি, অত্যাচারকে অত্যাচার বলেছি, মিথ্যাকে মিথ্যা বলেছি, – কাহারো তোষামোদ করি নাই, প্রশংসার এবং প্রসাদের লোভে কাহারো পিছনে পোঁ ধরি নাই, – আমি শুধু রাজার অন্যায়ের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করি নাই, সমাজের, জাতির, দেশের বিরুদ্ধে আমার সত্য-তরবারির তীব্র আক্রমণ সমান বিদ্রোহ ঘোষনা করেছে,– তার জন্য ঘরে- বাইরের বিদ্রুপ, অপমান, লাঞ্ছনা, আঘাত আমার উপর অপর্যাপ্ত পরিমাণে বর্ষিত হয়েছে, কিন্তু কোন কিছুর ভয়েই নিজের সত্যকে, আপন ভগবানকে হীন করি নাই, লোভের বশবর্তী হয়ে আত্ম-উপলব্ধিকে বিক্রয় করি নাই, নিজের সাধনালব্ধ বিপুল আত্মপ্রসাদকে খাটো করি নাই, কেননা আমি যে ভগবানের প্রিয়, সত্যের হাতের বীণা; আমি যে কবি, ামার আত্মা যে সত্যদ্রষ্টা ঋষির আত্মা। আমি অজানা অসীম পুর্ণতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছি। এ আমার অহঙ্কার নয়, আত্ম-উপলব্ধির আত্ম-বিশ্বাসের চেতনালব্ধ সহজ সত্যের সরল স্বীকারোক্তি। আমি অন্ধ-বিশ্বাসে, লোভের লোভে, রাজভয় বা লোকভয়ে মিথ্যাকে স্বীকার কররতে পারি না। অত্যাচারকে মেনে নিতে পারি না। তাহলে যে আমার দেবতা আমায় ত্যাগ করে যাবে। আমার এই দেহ-মন্দিরে জাগ্রত দেবতার আসন বলেই তো লোকে এ-মন্দিরকে পূজা করে, শ্রদ্ধা দেখায়, কিন্তু দেবতা বিদায় নিলে এ শূন্য মন্দিরের আর থাকবে কী? একে শুধাবে কে? তাই আমার কণ্ঠে কাল-ভৈরবের প্রলয়- তুর্য বেজে উঠেছিল; আমার হাতের ধূমকেতুর অগ্নি-নিশান দুলে উঠেছিল, সে সর্বনাশা নিশান– পুচ্ছে মন্দিরের দেবতা নট-নারায়ণ রূপ ধরে ধ্বংস-নাচন নেচেছিল। এ ধ্বংস-নৃত্য সব সৃষ্টির পূর্ব-সুচনা। তাই আমি নির্মম নির্ভীক উন্নত শিরে সে নিশান ধরেছিলাম, তাঁর তুর্য বাজিয়েছিলাম। অনাগত অবশ্যম্ভাবী মহারুদ্রের তীব্র আহ্বান আমি শুনেছিলাম, তাঁর রক্ত- আঁখির হুকুম আমি ইঙ্গিতে বুঝেছিলাম। আমি তখনই বুঝেছিলাম, আমি সত্য

রক্ষার, ন্যায় উদ্ধারের বিশ্ব প্রলয় বাহিনীর লাল সৈনিক। বাংলার শ্যাম শ্মশানের মায়া নিদ্রিত ভূমে আমায় তিনি পাঠিয়েছিলেন অগ্রদুত তূর্যবাদক করে। আমি সামান্য সৈনিক, যতটুকু ক্ষমতা ছিল তা দিয়ে তাঁর আদেশ পালন করেছি। তিনি জানতেন .... প্রথম আঘাত আমার বুকেই বাজবে, তাই আমি এবারকার প্রলয় ঘোষণার সর্বপ্রথম আঘাতপ্রাপ্ত সৈনিক মনে করে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করেছি। কারাগার-মুক্ত হয়ে আমি আবার যখন আঘাত-চিহ্নিত বুকে, লাঞ্ছনা- রক্তা ললাটে, তাঁর মরণ-বাঁচা-চরণমুলে গিয়ে লুটিয়ে পড়ব, তখন তার সকরুণ প্রসাদ চাওয়ার মৃত্যুঞ্জয় সঞ্জীবনী আমায় শ্রান্ত, আমায় সঞ্জীবিত অনুপ্রাণিত করে তুলবে। সেদিন নতুন আদেশ মাথায় করে নতুন প্রেরণা-উদ্বুদ্ধ আমি, আবার তাঁর তরবারি-ছায়াতলে গিয়ে দণ্ডায়মান হব। সেই আজো-না-আসা রক্ত ঊষার আশা, আনন্দ, আমার কারাবাসকে – অমৃতের পুত্র আমি, হাসিগানের কলোচ্ছ্বাসে স্বর্গ করে তুলবে। চিরশিশু প্রাণের উচ্ছল আনন্দের পরশমণি দিয়ে নির্যাতন লোহাকে মণিকাঞ্চনে পরিণত করবার শক্তি ভগবান আমায় না চাইতেই দিয়েছেন। আমার ভয় নাই, দুঃখ নাই; কেননা ভগবান আমার সাথে আছেন। আমার অসমাপ্ত কর্তব্য অন্যের দ্বারা সমাপ্ত হবে। সত্যের প্রকাশ-পীড়া নিরুদ্ধ হবে না। আমার ঘাতের ধূমকেতু এবার ভগবানের হাতের অগ্নি-মশাল হয়ে অন্যায়-অত্যাচারকে দগ্ধ করবে। আমার বহ্নি–এরোপ্লেনের সারথি হবেন এবার স্বয়ং রুদ্র ভগবান। অতএব, মাভৈঃ, ভয় নাই।

কারাগারে আমার বন্দিনী মায়ের আঁধার-শান্ত কোল এ অকৃতী পুত্রকে ডাক দিয়েছে। পরাধীন অনাথিনী জননীর বুকে এ হতভাগ্যের স্থান হবে কিনা জানি না, যদি হয় বিচারককে অশ্রু-সিক্ত ধন্যবাদ দিব। আবার বলছি, আমার ভয় নাই, দুঃখ নাই। আমি 'অমৃতস্য পুত্রঃ'। আমি জানি–

"ঐ অত্যাচারীর সত্য পীড়ন
আছে তার আছে ক্ষয়;
সেই সত্য আমার ভাগ্য-বিধাতা
যার হাতে শুধু রয়।"

নজরুলের এই বক্তব্য আমার জানা মতে অভিনব এবং এমন ধারায় কোন কবি কিংবা রাজনীতিবিদ রাজদণ্ডাদেশের সম্মুখে এমন তেজোদীপ্ত, সাহসী এবং অকুতোভয়ে বক্তব্য দিতে পেরেছেন কিনা আমার জানা নেই, নজরুলের নিন্দুকেরা কবির লেখায় খুঁত ধরতে ব্যস্ত। সোনাতে খাদ থাকে, তা না হলে সোনা হয় না। নজরুলের কাব্যে খুঁত থাকা অস্বাভাবিক নয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরও এমন খুঁত রয়েছে। কিন্তু সার্বিকভাবে প্রতিভাই বিচার্য। নজরুলের প্রতিভা বিচিত্রগামী। কিন্তু সব ছাড়িয়ে তিনি কবি সৈনিক। বাল্যকালেই তিনি বৃটিশ বিরোধী ছিলেন। শৈলজানন্দের বিবরণে তার উল্লেখ আছে। নজরুল প্রকৃতই সাহিত্যে দেশপ্রেমী সৈনিকের অবস্থানকেই উজ্জ্বল করে তুলেছেন। দেশের জন্য তিনি আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর সাহিত্য 'দ্রোহের মধ্যেই সৃষ্ট। তাঁর

কাব্য-সাহিত্যের এই ভাষা তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি। কাব্য ও গানের ভাষা প্রয়োগেও তিনি অভিনব।

নজরুলের 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' তাঁর হৃদয় নিসৃত সত্যানুভূতির প্রকাশ। রাজদ্রোহের শাস্তি ফাঁসি, নজরুলের ক্ষেত্রে এমনটিই হতে পারতো। নজরুল জানতেন না তাঁর বিচার কতদূর গড়াতে পারে। এমন অবস্থায় এমন দু:সাহসিক বক্তব্য পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। প্রতিটি বাক্যকে তিনি শাণিত করেছেন তাঁর বক্তব্যকে জোরালো এবং স্পষ্ট করে তুলতে। এখানে সাহিত্যরস অনুপস্থিত নয়– হয়তো তা রুদ্ররসে সিক্ত, কিন্তু বেগবান। ভারতের কোন রাজনীতিবিদ স্ব-জাতির মুক্তির জন্য নজরুলের মতো জীবনবাজি রেখেছিলেন কিনা জানি না। কিন্তু নজরুল সে সময়ের মুক্তিকামী বিপ্লবী–সন্ত্রাসীদের প্রেরণার উৎস ছিলেন।

মুজাফ্ফর আহমদ বলেছেন, "ধুমকেতু'র মারফতে নজরুল মূলত: তাঁর আবেদন জানাচ্ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিত তরুণদের বরাবরে। নিরুপদ্রব অসহযোগ আন্দোলনের খাতিরে বাঙলার সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা তাঁদের কার্যকলাপ বন্ধ রেখেছিলেন। নজরুলের আবেদন আসলে পৌঁছে যাচ্ছিল তাদেরই নিকটে।.....এখানেই 'ধুমকেতু' বেশী জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরাও এই শ্রেণীর লোক। কাজেই নজরুলের আবেদনে তাঁরাই নূতন করে চেতনা লাভ করেছিলেন। এটা আমার অনুমানের কথা নয়। শুধু যে তরুণেরা নিকটে আসছিলেন তা নয়, সন্ত্রাসবাদী 'দাদা'রাও (নেতারা) এসে তাকে আলিঙ্গন করে যাচ্ছিলেন।.... অতিমাত্রায় নিরুপদ্রবতা প্রচারের ফলে দেশ খানিকটা মিইয়ে গিয়েছিল। এই মিইয়ে পড়া থেকে নজরুল তাঁর লেখার ভিতর দিয়ে দেশকে খানিকটা চাঙ্গা করে তুলতে চেয়েছিল। এই করতে গিয়ে সে যে ঢেউ তুলেছিল তার দোলা লাগল গিয়ে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের প্রাণে। 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' ভারতের সকল মুক্তিকামী মানুষদের বিপ্লবী বাংলার প্রতিচ্ছবি হয়ে থাকলো।

নজরুলের 'ধুমকেতু' বন্ধ হবার পেছনে তাঁর লেখা 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতাটি দায়ী ছিল। এই কবিতায় তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে উপমা-প্রতীক্ষী শব্দের সকল প্রয়োগে তাঁর তীব্র ধিক্কার প্রকাশ করেছেন। নজরুল কবিতাটি 'আন্দবাজার পত্রিকা'র পূজা সংখ্যার জন্য লিখেছিলেন।

পত্রিকার মালিক পক্ষের শ্রী মৃণাল কান্তি ঘোষ এর অনুরোধক্রমে নজরুল এই কবিতাটি লিখেছিলেন। কিন্তু কবিতাটি পাঠ করার পর সম্পাদক লেখাটি ছাপলেন না এই ভয়ে যে কবিতাটি যদিও হিন্দু দেবীকে নিয়ে লেখা কিন্তু এর প্রতি শব্দে বৃটিশ সরকার ও তাঁর শোষণের বিরুদ্ধে দু:সাহসিক প্রতিবাদ রয়েছে। আনন্দবাজার বৃটিশ সরকারকে খেপাতে চাইল না। ফলে কবিতাটি ছাপা হ'ল না। শেষ মেষ 'ধুমকেতু'তে তা ছাপা হলে নজরুল সরাসরি বৃটিশরাজের রোষানলে পড়ে গেলেন। কবিতাটি হলেও এখানে তার উল্লেখ করছি এ কারণে যে, পাঠক সাধারণ বুঝবেন নজরুল কেমন

চমৎকার ভাবে ধর্মীয় শব্দাবলীকে সাহিত্যের মাধ্যমে অশূর বধের মতো ইংরেজ বধের পরিকল্পনা করেছিলেন। এমন বুকের পাটা কোন বাঙালী কবির ছিল না। কাব্য সাহিত্যে ভাষা ও প্রতীকের এমন প্রয়োগ সে সময়ের অন্য কোন রচনায় পাওয়া যায় না। নিম্নে কবিতাটির উল্লেখ করা হলঃ

আনন্দময়ীর আগমনে

আর কতকাল থাকবি বেটী মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল ?
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি চাঁড়াল।
দেব-শিশুদের মারছে চাবুক, বীর যুবাদের দিচ্ছে ফাঁসি,
ভু-ভারত আজ কসাইখানা, আসবি কখন সর্বনাশী?
দেবসেনা আজ টানছে ঘানি তেপান্তরের দীপান্তরে,
রণাঙ্গনে নামবে কে আর তুই না এলে কৃপাণ ধরে?
বিষ্ণু নিজে বন্দী আজি ছয়বছরি ফন্দি-কারায়,
চক্র তাহার চরকা বুঝি ভণ্ড-হাতে শক্তি–হারায়।
মহেশ্বর আজ, সিন্ধুতীরে যোগাসনে মগ্নধ্যানে
অরবিন্দ চিত্ত তাঁহার ফুটবে কখন কে সে জানে।
সদ্য অসুর গ্রাসচ্যুত ব্রহ্মা চিত্তরঞ্জনে হায়
কমণ্ডুলুর শান্তি বারি সিঞ্চি যেন চাঁদ নদীয়ায়
শান্তি শুনে তিক্ত এ মন কাঁদছে আরো ক্ষিপ্ত রবে,
মরার দেশের মড়া-শান্তি, সে তে আছেই, কাজ কি তবে;
শান্তি কোথায় ? শান্তি কোথায় কেউ জানি না
মাগো তোর ঐ দনুজ-দলন সংহারিণী মূর্তি বিনা!
দেবতারা আজ জ্যোতিহারা ধ্রুব তাঁদের যায়না জানা,
কেউ বা দৈব অন্ধ মাগো কেউ বা ভয়ে দিনে কানা।
সুরেন্দ্র আজ মন্ত্রণা দেন দানব রাজার অত্যাচারে,
দম্ভ তাঁহার দম্ভোলি ভীম বিকিয়ে দিয়ে পাঁচ হাজারে।
রবির শিখা ছড়িয়ে পড়ে দিক হতে আজ দিগন্তরে
সে কর শুধু পশল না মা অন্ধকারার বন্ধ ঘরে।
গগন পথে রবি-রথের সাথ সারথি হাঁকায় ঘোড়া
মর্তে দানব মানব পিঠে সওয়ার হয়ে মারছে কোড়া।
বারি-ইন্দ্র বরুণ আজি করুণ সুরে বংশী বাজায়
বুড়ি গঙ্গার পুলিন বুকে বাঁধছে ঘাটি দস্যু রাজায়।
পুরুষগুলোর ঝুটি ধরে বুরুশ করায় দানব জুতো
মুখো ভজে আল্লা হরি, পূজে কিন্তু ডাণ্ডা গুঁতো।

দাড়ি নাড়ে ফতোয়া ঝাড়ে মসজিদে যায় নামাজ পড়ে,
নায়কো খেয়াল গোলামগুলোর হারাম এসব বন্দী-গড়ে।
'লানত' গলায় গোলাম ওরা সালাম করে জুলুমরাজে
ধর্ম-ধ্বজা উড়ায় দাড়ি 'গলিজ' মুখে কোরান ভাঁজে
তাজ-হারা যার নাঙ্গা শিরে গরমাগরম পড়ছে জুতি
ধর্ম কথা বলছে তারাই পড়ছে তারাই কেতাব পুঁথি।
উৎপীড়ককে প্রণাম করে শেষে ভগবানে নমি,
টিকটিকির ঐ ল্যাজুর সম দিগ্বিদিকে উড়ছে টিকি,
দেবতার আগে পুজে দানব, তাদের কাছে সত্য শিখি।
পুরুষ ছেলে দেশের নামে চুগলি খেয়ে ভরায় উদর
টিকটিকি হয়, বিষ্ঠা কি নাই- ছিছি এদের খাদ্য ক্ষুধার।
আজ দানবের রংমহলে তেত্রিশ কোটি খোজা–গোলাম
লাথি খায় আর চ্যাঁচায় শুধু, দোহাই হুজুর মলাম মলাম।
মাদীগুলোর আদি দোষ ঐ অহিংসা বোল নাকি নাকি
খাঁড়ায় কেটে কর মা বিনাশ নপুংসকের প্রেমের ফাঁকি।
হান তরবার আন্ মা সমর, অমর হবার মন্ত্র শেখা,
মাদীগুলোয় কর মা পুরুষ রক্ত দে মা রক্ত দেখা!
লক্ষ্মী স্বরস্বতীকে তোর আয় মা রেখে কমল-বনে,
বুদ্ধি-বুড়ো সিদ্ধিদাতা গণেশ-টনেশ চাইনা রণে।
ঘোমটা–পরা কলা-বৌ-এর গলা ধরে দাও করে দূর,
ঐ বুঝি দেব-সেনাপতি, ময়ূর চড়া জামাই ঠাকুর ?
দূর করে দে, দূর করে দে, এসব বালাই সর্বনাশী
চাই নাক ঐ ভাং-খাওয়া শিব, নেক নিয়ে তাঁয় গঙ্গামাসী।
তুই একা আয় পাগলী বেটী তাথৈ তাথৈ নৃত্য করে
রক্ততৃষায় 'ময় ভুখা হুঁর' কাঁদন-কেতন কণ্ঠে ধরে
"ময় ভুখা হুঁর' রক্তক্ষেপী ছিন্নমস্তা আয় মা কালী,
গুরুর বাগে শিখ সেনা তোর হুঙ্কারে ঐ "জয় আকালী"।
এখনো তোর মাটির গড়া মৃন্ময়ী ঐ মূর্তি হেরি
দু'চোখ পুরো জল আসে মা, আর কতকাল করবি দেরী ?
মহিষাসুর বধ করে তুই ভেবেছিলি রইবি সুখে,
পারিস্নি তা ত্রেতা যুগে টলল আসন রামের দুখে।
আর এলিনে রুদ্রাণী তুই জানিনে কেউ ডাকলে কিনা
রাজপুতনায় বাজল হঠাৎ 'ময় ভুখা হুঁর' রক্ত বীণা।
বৃথাই গেল সিরাজ টিপু মীর কাসিমের প্রাণ বলিদান

চণ্ডি! নিলি যোগমায়া-রূপ, বলল সবাই বিধির বিধান।
হঠাৎ কখন উঠল ক্ষেপে বিদ্রোহীনি ঝান্সি-রাণী,
ক্ষ্যাপা মেয়ের অভিমানেও এলিনে তুই মা ভবানী।
এমনি করে ফাঁকি দিয়ে আর কতকাল নিবি পূজা?
পাষাণ বাপের পাষাণ মেয়ে, আয় মা এবার দশভুজা।
বছর বছর এ অভিনয় অপমান তোর, পূজা নয় এ,
কি দিস আশী কোটি ছেলের প্রণাম চুরির বিনিময়ে
অনেক পাঁঠা মোষ খেয়েছিস, রাক্ষসী তোর যায়নি ক্ষুধা,
আয় পাষাণী এবার নিবি আপন ছেলের রক্ত সুধা।
দুর্বলেরে বলি দিয়ে ভীরুব এ হীন শক্তি পূজা
দূর করে দে, বল মা, ছেলের রক্ত মাগে মা দশভূজা।
সেইদিন জননী তোর সত্যিকারের আগমনী,
বাজবে বোধন- বাজনা সেদিন গাইব নব জাগরণী।
'ময় ভুখা হুঁর' বলে আয় এবার আনন্দময়ী
কৈলাস হাতে গিরি রানীর মা- দুলালী কন্যা অয়ি।
আয় উমা আনন্দময়ী। (ধুমকেতু' ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯২২)

এক অভিনব ভাবে পূজার নৈবেদ্য সাজালেন নজরুল। ঘুমিয়ে পড়া জাতিকে জাগাবার মন্দ্রে দীক্ষিত করবার জন্য এ এক অসাধারণ কৌশল করলেন তিনি। মানুষের সাজানো নৈবেদ্যকে দূরে সরিয়ে স্রষ্টার সত্য-কঠোর মূর্তিকে তিনি আবাহন করলেন, দুর্ভাগা মানুষের মুক্তির জন্য। দীর্ঘদিন ধরে অত্যাচারী ইংরেজের শোষণ শাসনে যে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হয়েছিল ভারতবর্ষে, তা থেকে মুক্তি পেতে তিনি হিন্দু-মুসলিম উভয় জাতিকে কষাঘাত করেছেন নির্মমভাবে। এটার প্রয়োজন ছিল। নজরুল নিজেই নিয়েছেন নৈয়ায়িকের ভূমিকা। কলমযুদ্ধে ভারতের মুক্তি সংগ্রামে নজরুলের যে অবদান কোন রাজনীতিক তা স্বীকার না করলেও এ অসহায় জাতি তাঁকে কখনও ভুলবেনা। এতদিন ধরে তাঁকে ভোলেওনি কেউ। মানুষের অন্তরের মণিকোঠায় তিনি গোটা ভারতবর্ষের মুক্তির অগ্রনায়কদের অন্যতম। কবি হিসেবে রাজাধিরাজ। 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতাটির উৎস নজরুলের দেশাত্মবোধের চরম দৃষ্টান্ত। পৃথিবীর ইতিহাসে ধর্মের সত্য কঠিন এবং চির নির্মলরূপ মানুষের জন্যই উৎসারিত। ধর্মের জন্য মানুষ নয়, মানুষের জন্য ধর্ম। মানুষের এই অবস্থান কলঙ্কিত হয়েছে ধর্ম ব্যবসায়ীদের কারণে। ইংরেজ যে অত্যাচারে খড়গকৃপাণ এদেশের নিরীহ মানুষের উপর প্রতিনিয়ত চালিয়েছিল তা থেকে মুক্তির এই আর্তনাদ নিবেদিত হয়েছিল স্রষ্টার পদপাদ্যে। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কবিতা কেউ লেখেনি। সাম্রাজ্যবাদীদের নোবেল পুরস্কার তিনি পাননি। তাঁর প্রয়োজনও নেই। কিন্তু মানুষের হৃদয় নিঃসৃত 'নোবেল' পুরস্কার তিনি পেয়েছেন। এই কবিতায় তিনি হিন্দু মুসলমান উভয় জাতিকে কষাঘাত করেছেন। ভাব, ভাষা এবং

ছন্দের ওপর এমন প্রাধান্য অন্যকোন কবিতায় লক্ষ্য করা যায় না। কোন হিন্দু কবি তাঁর ধর্মের শব্দাবলীর এমন সুষম প্রয়োগ করতে সক্ষম হননি। প্রতিটি শব্দ যেন শাণিত অস্ত্র। হিন্দু মুসলমান উভয় ধর্মের প্রচলিত রূপকে তিনি বন্ধ্যা বলে কটাক্ষ করেছেন। তিনি অধর্মকে বিধ্বংশী বাক্যবানে নির্মমভাবে পুড়িয়ে চির সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। সে অবস্থানে পড়েছে ইংরেজ এবং তার অধর্ম। কবিতার এমন ভাসা ও বাকচাতুর্য বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ, অভিনব।

'রাজবন্ধীর জবানবন্দী'তেও তাঁর সেই বিজয়গাঁথা প্রতিধ্বনিত হয়েছে। টনক নড়েছে বৃটিশরাজের। 'রাজবন্দীর জবানবন্ধী' অসীম ক্ষমতাধরের বিরুদ্ধে এক দুরন্ত এবং দুর্বীনিত দুঃসাহসিকতা। আনন্দময়ীর আগমনে যে কথাগুলো নজরুল প্রয়োগ করেছিলেন কাব্যের পরিভাষায়, রাজবন্দীর জবানবন্দী' পৃথিবীর তাবৎ শোষক এবং শাসকদের বিরুদ্ধে রক্ত সলিলে ধোয়া মুক্তিসনদ। জাতি তাঁকে ভোলেনি। সমগ্র জাতির পক্ষে সেদিন নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় নজরুলকে সংবর্ধিত করেছিলেন।

আজ নজরুল নেই। কিন্তু তাঁর লেখনি রয়ে গেছে। যুগে যুগে কালে কালে তাঁর সেই লেখনি অসহায় জাতিকে নিরন্তর পথ দেখাবে। অন্ধকারে জ্বালাবে অগ্নিশিখা। সাংবাদিক নজরুলের এ বিজয়গাঁথা অমর কাব্য! বলেছি, নজরুল সেদিন আদালতের নিকট যে 'জবানবন্দী' দিয়েছিলেন তা একজন কবির আত্মপক্ষ সমর্থন ছিল না। তাঁর 'জবানদবন্দী' তে একটি পরাধীন দেশের মুক্তিকামী একজন কবির পুনরায় যুদ্ধ ঘোষণার দৃঢ়প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে। একটি দেশের জন্য, জাতির জন্য এককভাবে এমন লড়াইয়ের কোন নজির নেই পৃথিবীর ইতিহাসে। বৃটিশরাজের তীব্র রোষানলের সামনে দাঁড়িয়ে নজরুল সেদিন বলেছিলেন যে অপরাধে তাঁকে রাজদ্রোহের শাস্তি দেওয়া হ'ল কারামুক্তির পরেও তিনি সুযোগ পেলে এমন অপরাধ পুনরায় করবেন। নজরুল সেদিন তাঁর 'জবানবন্দীতে আরও বলেছিলেন:

"আজ ভারত পরাধীন, তার অধিবাসীবৃন্দ দাস। এটা নির্জলা সত্য। কিন্তু দাসকে দাস বললে, অন্যায়কে অন্যায় বললে এ রাজত্বে তা হবে রাজদ্রোহ। এ সত্য ন্যায়ের শাসন হতে পারে না। এই যে জোর করে সত্যকে মিথ্যা, অন্যায়কে ন্যায়, দিনকে রাত বলানো– কি সত্য সহ্য করতে পারে? এ শাসন কি চিরস্থায়ী হতে পারে ? এতদিন হয়েছিল, হয়তো সত্য উদাসীন ছিল বলে। কিন্তু আজ সত্য জেগেছে, তা চক্ষুষ্মান জাগ্রত-আত্মা মাত্রই বিশেষরূপে জানতে পেয়েছে।

এ অন্যায় শাসন-ক্লিষ্ট বন্দী সত্যের পীড়িত ক্রন্দন আমার কণ্ঠে ফুটে উঠেছিল বলেই কি আমি রাজদ্রোহী? এ ক্রন্দন কি একা আমার? না– আমার কণ্ঠে ঐ উৎপীড়িত নিখিল নীরব ক্রন্দসীর সম্মিলিত সরব প্রকাশ? আমি জানি, আমার কণ্ঠের ঐ প্রলয় হুঙ্কার একা আমার নয়, সে যে নিখিল-আত্মার যন্ত্রণা-চিৎকার। আমায় ভয় দেখিয়ে,

মেরে, ঐ ক্রন্দন থামানো যাবে না। হঠাৎ কখন আমার কণ্ঠের এই হারা বাণীই তাদের আর একজনের কণ্ঠে গর্জন করে উঠবে।

আজ ভারত পরাধীন না হয়ে যদি ইংল্যান্ড ভারতের অধীন হত এবং নিরস্ত্রীকৃত উৎপীড়িত ইংলন্ড অধিবাসবিন্দ স্বীয় জন্মভূমি উদ্ধার করবার জন্য বর্তমান ভারতবাসীর মত অধীর হয়ে উঠত আর ঠিক সেই সময় আমি হতুম এমনি বিচারক এবং আমার মতই রাজদ্রোহ অপরাধে ধৃত হয়ে আমার সম্মুখে এই বিচারক বিচারার্থ নীত হতেন। তা হলে এই সময় এই বিচারক আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যা বলতেন, আমিও তাই এবং তেমনি করেই বলছি।

অনাগত অবশ্যম্ভাবী মহা রুদ্রের তীব্র আহবান আমি শুনেছিলাম, তাঁর রক্তআঁখির হুকুম আমি ইঙ্গিতে বুঝেছিলাম। আমি তখনই বুঝেছিলাম। আমি সত্য রক্ষার ন্যায় উদ্ধারের বিশ্ব-প্রলয় বাহিনীর লাল সৈনিক। আমি সামান্য সৈনিক, যতদুর ক্ষমতা ছিল, তা' দিয়ে তাঁর আদেশ পালন করেছি।

তিনি জানতেন প্রথম আঘাত আমার বুকেই বাজবে, তাই আমি এবারকার প্রলয় ঘোষণার সর্বপ্রথম আঘাত প্রাপ্ত সৈনিক মনে করে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করেছি। কারাগার মুক্ত হয়ে আমি আবার যখন আঘাত চিহ্নিত বুকে, লাঞ্ছনা-রক্ত-ললাট, তাঁর মরণ-বাঁচা-চরণ মূলে গিয়ে লুটিয়ে পড়ব, তখন তার স্করণ প্রসাদ চাওয়ার মৃত্যুঞ্জয় সঞ্জীবনী আমার শ্রান্ত আমায় সঞ্জীবিত অনুপ্রাণিত করে তুলবে। সেদিন নতুন আদেশ মাথায় করে নতুন প্রেরণা-উদ্বুদ্ধ আমি, আবার তাঁর তরবারি ছায়াতলে গিয়ে দন্ডায়মান হব।"

নজরুলের এমন নির্ভীক, অকুতোভয় জবানবন্দী শুধু মাত্র জনাববন্দীই ছিল না। রাজদ্রোহের অপরাধে অপরাধী একজন কবির অমর রচনা হিসেবেই তা চির অম্লান থাকবে। রবীন্দ্রনাথের মতো দীর্ঘ শান্তিময় জীবন নজরুল পাননি। শিলাইদহে পদ্মাবাটে আকাশের দিকে তাকিয়ে তিনি কল্পনা রাজ্যের সাহিত্য নির্মাণ করতে পারেননি, কিন্তু তিনি রণাঙ্গনে থেকে লড়াই এর মাঝে মৃত্যুকে বাজি রেখে যে সাহিত্য তিনি রচনা করেছেন তাকে অস্বীকার করবে কে? দু'একজন বুদ্ধদেব, সজনীকান্ত চিরকাল আক্ষেপ করেই মরবেন। নজরুলের তাতে কিছুই এসে-যাবে না। বস্তুত: এমনই হয়েছিল। সজনীকান্ত, বুদ্ধদেবকে স্বীকার করতে হয়েছিল, নজরুল অনন্য প্রতিভা– সারা ভারতবর্ষে যার তুলনা কখনই করা যাবে না।

এখানে বলা প্রয়োজন যে নজরুলের কারাদন্ড হয়েছিল তাঁর নিজের পত্রিকা 'ধুমকেতু' তে 'আনন্দময়ীর আগমনে' একটি কবিতা লেখার জন্য। কবিতাটি প্রকাশের পর কবি রাজরোষে পড়েন এবং ফৌজদারী আইনের (ইন্ডিয়ান স্পেসাল কোড) ১২৪-ক এবং ১৫৩-ক ধারা মতে রাজদ্রোহের অভিযোগে নজরুল গ্রেফতার হয়। গ্রেফতারের দন্ডবিধিতে বলা হয়; ১২৪-ক ধারা অনুসারে :

Whoever by words, either spoken or writing or by signs or by besible reponsentation or otherise brings or attempts to bring it to hatrud or contempt or entices or attempts to exercise disaffection towards how Mayesty to or the government established by law in Britisk Insg, shall be punijhed with imprisonment which may extend to three years so which fine maybe added, or will fine.

১৫৩-ক ধারা অনুসারে বলা হয়:

Whoever by words, either spoken or written, or by rigus, a by visuble reponsentation, or others enmity or hatred lectureen difficult clasees of .. Majesty's sulyeets shall be punished with in.....which may extend to two years, or with fine or with both.

কমরেড ফৌজদারী দন্ডবিধির ১২৪-ক এবং ১৫৩-ক ধারা অনুযায়ী অভিযুক্ত করে ১৯২২ সালের ২৩ নভেম্বর নজরুলকে কুমিল্লায় গ্রেফতার করা হয় এবং তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। ১৯২২ সালের ৮ নভেম্বর ৩২নং কলেজ স্ট্রীটি বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির বাড়ীতে 'ধুমকেতু' মুদ্রাকর ও প্রকাশক আফজালুল হক গ্রেফতার হন। তবে আফজালুল হক পরবর্তীতে রাজসাক্ষী হিসেবে চিহ্নিত হন।

নজরুলের কারাদন্ডের কথা আগেই বলেছি। সে সময় অর্থাৎ ১৯২৩ সালের ১৩ জানুয়ারী আনন্দবাজার পত্রিকায় বলা হয়।

ধুমকেতুর মামলা

"গত শুক্রবার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মি: সুইন হোর এজলাসে 'ধুমকেতু' সম্পাদক কাজী নজরুল ইসলামের মামলা উঠিয়াছিল। কাজীর পক্ষের উকিলগণ একটি লিখিত বর্ণনাপত্র দাখিল করেন। এই বর্ণনাপত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে, সরকারি উকিল তাঁহার প্রবন্ধের ঠিক ঠিক অনুবাদ করেন নাই। তাই ১৬ তারিখ পর্যন্ত মামলা মুলতবী আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এই মামলায় নজরুল তাঁর 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' পত্র স্থাপন করেন। অত:পর মুলতবী মামলার রায় প্রদান করা হয় ১৭ জানুয়ারী। নজরুল ইসলাম এক বৎসরের জন্য কারাদন্ডে দন্ডিত হন। আনন্দবাজার পত্রিকায় সেসময় নিম্নোক্ত প্রতিবেদন ছাপা হয় ঃ

বিদ্রোহী কবির কারাদন্ড

গতকল্য 'ধুমকেতু'র সম্পাদক কাজী নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ অভিযোগের মামলার শেষ হইয়াছে। 'বিদ্রোহীর কৈফিয়ৎ' ও আনন্দময়ীর আগমনে' এই দুটি প্রবন্ধ লেখার জন্য বিচারক তাঁহার প্রতি এক বৎসর সশ্রম কারাদন্ডের আদেশ দিয়াছেন।"

এখানে দুটি প্রবন্ধের পরিবর্তে 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' প্রবন্ধ ও আনন্দময়ীর আগমন কবিতা হবে, কোন প্রবন্ধ নয়।

'ধুমকেতু' সম্পর্কে গোয়েন্দা বিভাগের এইচ গ্রীনফিল্ড ১৯২৪ সালের ১৯ জুন বাংলা সরকারের আক্তার সেক্রেটারীকে যে রিপোর্ট প্রদান করে তা নিম্নরূপ :

Started from 11th August, 1922, Preacles emaneipanon from all rushaint....politial, social or religions, independent in toue, the late editor Nazrul was convicted sec. 124-A and 153A 9PC to 1 year r.l. on the acth Gaovany 1923.

বৃটিশ আমলে তৎকালীন বাংলা সরকারের চীফ সেক্রেটারী এল কারণে ১৯২২ সালের বাংলার সংবাদপত্রগুলি সম্পর্কে ভারতের বৃটিশ সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারিয়েট একটি রিপোর্ট পাঠান। এই রিপোর্টে নজরুলের 'ধুমকেতু' পত্রিকাকে বিপ্লবী এবং 'উগ্র' হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

শিশির কর তাঁর 'নিষিদ্ধ নজরুল' গ্রন্থ এর বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। রিপোর্টটির কিয়দংশ নিম্নে দেওয়া হল :

Its bristling allusions to Hindu mythology often betrated false analogies and its blustering diction offended against all classic traditions of repose, but inspite of all these and perhaps, because of all these and the reulting correspondence of the matter to the turged manner of expression the whilwind energy of the style and the inflammatory character of the languages had a great unsettling effect on premature and ill balanced minds, with whom the paper was prosecuted more than once.

'ধুমকেতু' আসলে সংবাদপত্রের জগতে একটি বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল। গণমানুষের কথা এবং ভারতে বৃটিশ রাজের অত্যাচার এবং শোষণের কথা নির্ভীক সাহসিকতার সঙ্গে প্রকাশ করা নজরুলের আমরণ প্রতিবাদী চরিত্রের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। 'ধুমকেতু'র আবির্ভাব এবং তিরোধনকাল স্বল্প সময়ের হলেও জনজীবনে তার প্রভাব ছিল অসাধারণ।

নজরুলের সক্রিয় জীবন বেশীদিনের ছিল না। এই অল্প সময়ে তাঁর 'লেখক-কাল' দুরন্ত প্রভাব বিস্তার করে চলেছে অদ্যাবধি।

'ধুমকেতু' সাপ্তাহিক কি অর্ধসাপ্তাহিক এ নিয়ে বাক-বিতন্ডা রয়েছে। জানা যায় যে পত্রিকাটি সাপ্তাহিক হলেও কখনও সপ্তাহে দু'বার প্রকাশিত হয়েছে। হয়তো এ কারণে 'ধুমকেতু' কে বৃটিশ সরকারি রিপোর্টেই অর্ধসাপ্তাহিক' বলা হয়েছে।

কমরেড মুজাফ্ফর আহমদ বলেন: "আসলে নজরুল ইসলামের 'ধুমকেতু' কিন্তু সপ্তাহে দু'বার বের হতো। 'সপ্তায় দু'বার দেখা দেবে" এই ঘোষণা কাগজেই থাকত।

'ধুমকেতু' কখনও 'সাপ্তাহিক' থেকে অর্ধ-সাপ্তাহিক হয়নি। 'ধুমকেতু'র প্রতি পৃষ্ঠার সাইজ ছিল লম্বায় পনের ইঞ্চি ও চওড়ায় দশ ইঞ্চি, অর্থাৎ ক্রাউন ও ফোলিও সাইজ। এই রকম আট পৃষ্ঠার কাগজ ছিল 'ধুমকেতু'। একখানা 'ধুমকেতু'র নগদ দাম ছিল এক আনা আর তার এক বছরের গ্রাহক হওয়ার চাঁদা ছিল পাঁচ টাকা।

'ধুমকেতু'র সারথি (সম্পাদক) ও স্বত্ত্বাধিকারী ছিল কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁর কর্মসচিব (ম্যানেজার) ছিলেন শ্রী শান্তিপদ সিংহ। কাগজের মুদ্রাকর ও প্রকাশক ছিলেন অফজালুল হক সাহেব।

নজরুলের কারাদন্ডে সমস্ত দেশজুড়ে বিক্ষোভ, আন্দোলন এবং প্রতিবাদ সভা হয়েছিল। পশ্চিম বাংলা ও পূর্ব বাংলায় নজরুলের মুক্তির জন্য মিছিল শ্লোগানে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হয়েছিল।

বস্তুত নজরুলকে নিয়ে দেশজুড়ে যে আন্দোলন, বিক্ষোভ হয়েছে, তেমন অন্য কারো ক্ষেত্রে হয়নি। নজরুলকে কারারুদ্ধ করা হলে সারা দেশ ক্ষোভে ফেটে পড়েছিল। এমন ব্যাপক প্রতিবাদের নানা কারণ আছে। যেসব বাঙালী কবির বই ইংরেজ আমলে বাজেয়াপ্ত হয়েছিল নিঃসন্দেহে নজরুল তাদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী কবি। আর জনপ্রিয়তায় তিনি তো সমসাময়িক সকলের উপরে ছিলেন। সে যুগে তরুণদের মুখে মুখে ফিরত তাঁর অগ্নিবীণার, ভাঙার গানের কবিতাগুলি। তদুপরি জেলের অবিচারের প্রতিবাদে কবি যখন দীর্ঘদিন অনশনে ছিলেন তখন স্বত:ই সারা দেশ বিচলিত হয়ে পড়েছিল। রবীন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র তাঁর জীবন রক্ষার জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন।

নজরুলের গ্রেফতার হওয়া সম্পর্কে কমরেড মুজাফ্ফর আহমদ লেখেন: "তারিখটা ১৯২২ সালের ৭ই নভেম্বর ছিল। কমরেড আব্দুল হালিম আর আমি সেদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে এক দোকানে চা খেয়ে বেড়াতে বেড়াতে 'ধুমকেতু' অফিসে গেলাম। আমরা তখন চাঁদনীর ৩ নম্বর গুমঘর লেনে আমার ছাত্রদের বাড়ীতে রাত্রে ঘুমাতাম। ৭ নম্বর প্রতাপ চাটুজ্যে লেনস্থিত 'ধুমকেতু' অফিসে গিয়ে দেখলাম সাত সকালেও শ্রী বীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এসে 'ধুমকেতু'র জন্য লিখছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই দোতলায় ওঠার সিঁড়িতে এক সঙ্গে অনেকগুলি জুতোর শব্দ শোনা গেল। পুলিশ এসেছে 'ধুমকেতু' অফিসে তালাশির পরওয়ানা ও কাজী নজরুল ইসলামের নামে গ্রেফতারী পরওয়ানা নিয়ে। নজরুল তখন সমস্তিপুরে গিয়েছিল বলে গ্রেফতার হয়নি। পুলিশ আসার মুহূর্তের ভিতরে বীরেন বাবু যে কোথায় উধাও হয়ে গেলেন আমরা তার কিছুই টের পেলাম না। পুলিশ প্রথমে নজরুলকে খুঁজল। আমরা জানালাম যে তিনি কলকাতার বাইরে কোথাও গেছেন। তখন পুলিশ আমাদের গভার্নমেন্ট অর্ডার দেখালেন যে ২৬শে সেপ্টেম্বর (১৯২২) তারিখে 'ধুমকেতু' তে প্রকাশিত 'আনন্দময়ীর আগমনে' শীর্ষক একটি কবিতা ও 'বিদ্রোহীর কৈফিয়ৎ' (অধ্যাপক সাতকড়ি মিত্রের ছোট বোনটির লেখা) শীর্ষক একটি

ছোট প্রবন্ধ বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে। পুলিশ এই সংখ্যার কপিগুলি নিয়ে যাবেন বললেন। তারপর বাড়ীতে তালাশ হলো, ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখের 'ধুমকেতুর যে কয়খানা কপি পাওয়া গেল তাই নিয়ে পুলিশ চলে গেলেন। আমাকে সার্চলিষ্টও দিয়ে গেলেন।.....

'ধুমকেতু'র অনেক লেখা নিয়েই নজরুলের নামে মোকদ্দমা হতে পারত। কিন্তু মোকদ্দমা হলো 'আনন্দময়ীর আগমনী'কে নিয়ে। এই কবিতাটি লেখার একটি ছোট্ট ইতিহাস আছে। দৈনিক 'আনন্দবাজার পত্রিকা' সে বছর প্রথম বা'র হয়েছিল। শ্রী সুরেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রী প্রফুল্ল সরকার ও শ্রী মৃণালকান্তি ঘোষ (অমৃতবাজার পত্রিকার শিশির কুমার ঘোষের ভ্রাতুষ্পুত্র) ছিলেন এই পত্রিকার মালিক। তাঁর মারফতে একটা বিজ্ঞাপন বা অন্য কিছু, মনে হয় বিজ্ঞাপনই, পেতে চেয়েছিল। মৃণাল বাবু তা পাইয়ে দিতে স্বীকার করে বলেছিলেন–যে তার আগে তুমি আনন্দবাজার পত্রিকার পূজা সংখ্যার জন্য একটি আগমনী কবিতা লিখে দাও।"

নজরুল তাই লিখেছিল "আনন্দময়ীর আগমনে!" কিন্তু এই কবিতা "আনন্দবাজার পত্রিকা'য় ছাপা না হয়ে কেন যে 'ধুমকেতু' তে ছাপা হয়েছিল তার কারণ আমি জানিনা। খুব সম্ভব কবিতাটি পড়ে আনন্দবাজার পত্রিকার কর্তৃপক্ষ তখন তা ছাপতে রাজী হননি। তাদের দৈনিক পত্রিকা তখনও নূতন ছিল।

কবিতাটি সরকারের বাজেয়াপ্ত হয়ে যাওয়ায় নজরুলের কোনো পুস্তকে তা ছাপা হতে পারেনি। দেশ যখন স্বাধীন হয়েছিল তখন নজরুলের সম্বিত ছিল না। ১৯২২ সালে যাঁরা কবিতাটি পড়েছিলেন তার দু'দশ ছত্র তাদের অনেকেরই মুখস্ত ছিল। নজরুল সম্বন্ধে নানা লেখায় এই ছত্রখানিই উদ্ধৃত হচ্ছিল। আমার লেখা 'কাজী নজরুল প্রসঙ্গে' যখন ছাপা হচ্ছিল তখন আমি দেখতে পেলাম যে 'ধুমকেতু'র সেই সংখ্যাটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রয়েছে। তা থেকে নিয়ে পুরো কবিতাটি আমি 'কাজী নজরুল প্রসঙ্গ' তে তুলে দিয়েছিলাম।" (কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা, পৃ: ১৬৬-১৬৭)

১৯২৩ সালের ১৬ই জানুয়ারী নজরুলের কারাদণ্ড চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মি: সুইনহো পাঠ করছিলেন তখন নজরুলের পক্ষে একজন তরুণ উকিল মি: সুইনহো কে অনুরোধ করেছিলেন যে, কবি যেন জেলে বিশেষ শ্রেণীর কয়েদীর মর্যাদা পান। সুইন হো বলেছিলেন যে রাজনীতিক অপরাধে দণ্ডিত বন্দী মাত্রেই জেলে বিশেষ শ্রেণীর কয়েদীর ব্যবহার পেয়ে থাকেন। প্রকৃত অর্থে, তখন পর্যন্ত সেই ব্যবস্থা চালু ছিল। নজরুলকে প্রেসিডেন্সী থেকে আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে পাঠানোর পর সেখানে নজরুল বিশেষ শ্রেণীর কয়েদীর ব্যবস্থা পেয়েছিলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে ইংরেজ সরকার রাজবন্দীদের সঙ্গে বিরূপ আচরণ শুরু করলেন। তারা রাজনীতিক বন্দীদের দু'ভাগে ভাগ করে বেশীর ভাগ বন্দীদের সাধারণ কয়েদীর পর্যায়ে নামিয়ে দেওয়া হল। নজরুলকেও সাধারণ কয়েদীদের পর্যায়ে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এ সময়ে তাঁকে

হুগলী সেন্ট্রাল জেলে রাখা হয়। এই জেলের পাশেই ছিল হুগলী রেলওয়ে স্টেশন। স্টেশনের প্লাটফরম অনেক উঁচু হওয়ায় সেখান থেকে হুগলী জেলের ভেতরে সব দেখা যেত এবং নজরুল এই জেলে আছেন জেনে অনেক রাজনীতিক তরুণ যুবক নজরুলের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেন। ইতোমধ্যে জেল কর্তৃপক্ষ তা জানতে পেরে জেলের প্রাচীর গায়ে টিনের দেওয়াল তুলে এই দেখাদেখি এবং আলাপচারিতা বন্ধ করে দিলেন। হুগলী জেলে নজরুলকে সাধারণ কয়েদীর পোষাক পরিয়ে সেই ধরনের ব্যবহার করা হলো। ফলে নজরুল তাঁর রাজনীতিক বন্ধুদের নিয়ে অনশন ধর্মঘট শুরু করে দিয়েছিলেন। অনশনের ফলে তাঁর শরীর ভেংগে পড়ছিল। এর ফলে জেলখানায় তাঁর রাজনীতিক কর্মীরাও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। জেলের বাইরে কোন ভাবে এ সংবাদ পৌঁছালে দেশের নেতৃবৃন্দ নজরুলের জন্য দারুণ উৎকণ্ঠা বোধ করে তাঁর অনশন ভাঙানোর চেষ্টা নিলেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অনশন ভাঙবার জন্য অনুরোধ করে টেলিগ্রাম করেছিলেন। সে টেলিগ্রাম ভুল ঠিকানায় যাওয়ায় নজরুলের কাছে তা পৌঁছায়নি। এ সময় নজরুলের গর্ভধারিনী মা-ও তাঁকে অনশন ভাঙানোর জন্য ছুটে এসেছিলেন। নজরুল তাঁর মায়ের সাথে দেখাও করেননি। ইতোমধ্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সভাপতিত্বে ১৯২৩ সালের ২১মে কলেজ স্কোয়ারে যে জনসভা হয় সেই সভায় অন্যান্যদের মধ্যে মৃণাল কান্তি বসু, মৌলভী মনিরুজ্জামান ইসলামবাদী, বৈরাগী ত্রিপাঠী, অতুল চন্দ্র সেন, হেমন্ত কুমার সরকার ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস বক্তৃতা করেন। সভায় নজরুলসহ অন্যান্য বন্দীদের অনশন ভঙ্গের জন্য প্রস্তাব গৃহীত হয়। স্থির হয় যে– আব্দুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী জনসভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে নজরুল ও অন্যান্য রাজবন্দীদের অনশন ভঙ্গ করার অনুরোধ জানাবেন। কারণ তাঁরা মনে করেছিলেন নজরুল বাংলা সাহিত্যের একজন বড় কবি এবং তিনি কবিতাকে এক নূতন জীবন দান করেছেন। ১৯২৩ সালের ২২মে অমৃত বাজার পত্রিকায় নিম্নবলিত সংবাদ প্রকাশিত হয়।

Kazi Nazrul Islam

38 days on Hunger strike. Meeting at College square

To give vent to the intensity of public feeling on the reported hunger strike of Kazi Nazrul Islam and other political prozoners in the Hoogly Jail as a protest against illtreatment by jail authorities a very largely attended public meeting under the Presidency of Deshbandhu Chattarangan Das was held at College square on Monday evening. The composition of the meeting was just in keeping with the tradition of college square meetings, Young man with bearing fees predomiinating. Proceedings were all along inttrusting and only a few but alongment and vigorous speechs were made the fallowing resolution was unanimously passed.

"That this public meeting of the citizens of Calcutta condemn the treatment meted out to the political prisoners in the Hoogly Jail for which Kazi nazrul Islam, Si Gopal Chadra Sen and Moulvi Sirajuddin Ahmed are on hunger strike for oner a month.

That this meeting is honour of opinion that hunger strike is not the proper ways to expences the protest of political presoners and sends the message through Dr. A Suhrawardy that they may give up the strike.

Babu Mrinal Kanti Bose in placing the abive resolution before the meeting narrated the condition oif hunger strikes, Moniruzzaman Islamabad, Bairagi Tripathy, Atul Chandra sen, Hemanta Kumar Sarker and Deshbandhu Chittaranjan Das spoke.

Deshbandhu Chittaranjan Das on declaring the resolution unanimously carried said that he knew the young Kazi very mentimathy as great poet fearless and fold having the courage of his conviction. He had very little hope, when such a youth as Kazi Nazrul ahd gone on hunger strike, that he would ever survive. The Young Kazi had given a new life to the Bengali poetry. But whatever it was they had not met them that day to enlogise the poet. It was that he was a great poet and they all felt for him."

জনসভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে ড. আব্দুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী ১৯২৩ সালের ২২ মে দু'জন সঙ্গী মৌলভী ওয়াজেদ আলী এবং মৌলভী ওমেদ আলীকে সাথে নিয়ে কাজী নজরুল ইসলাম ও অন্যান্য বন্দীদের সঙ্গে দেখা করেন এবং জনসভায় গৃহীত প্রস্তাব সম্পর্কে তাদের অবহিত করে অনশন ভঙ্গের জন্য অনুরোধ জানান। তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষ চন্দ্র বসু, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী সহ দেশবরেণ্য মানুষ এবং আপামর জনতার উদ্বিগ্নতার কথা জানান। নজরুল এবং অন্যান্যরা অনশন ভাঙতে রাজী হন। তবে তাঁদের পক্ষ থেকে জেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে খাদ্য ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে অভিযোগ করা হয়। ১৯২৩ সালের ২৩শে মে অতৃমবাজার পত্রিকা'য় নিম্নবর্ণিত সংবাদ প্রকাশিত হয়।

Hunger strike in Hugly jail
Dr, Suhrawardy and party
interview the strikers
Nazrul Islam and others
agree to take food

Accordign to an announcement in the press Dr. Abdullah Suhrawardy accompanied by Moulvi Omed Ali of the Bangiya

Mussalman Sahitya samity motored to the Hoogly jail on Tuesday and had an interview with Nazrul Islam and otehrs. He carried with him the message of the public meeting held at College square. On the 21st instant requesting the hunger strikers of the Hoogly jail to take food and delivered to Nazrul Islam and otehrs. He also personally requested them, on various grounds, not tio persist in the strike. Upon this day agreed to take food.

I is understood that they amde complaints, among otherthings, about the inefficient quantity and bad quality of their food and requested Dr. Abdullah suhrawardy to try to redness their grievances. It may be mentioned here that Dr. Suhrawardy went to Hoogly under a sense of an important public duty although there was illness in his family and undisposition of his own.

ড. সুহরাওয়ার্দী ছিলেন বেসরকারি জেল পরিদর্শক। তাই তিনি জেলে গেলে নজরুল এবং অনশনকারীরা তাঁকে জেলের নানা অব্যবস্থা সম্পর্কে অভিযোগ করেছিলেন। বলেছি, রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে দোলগ্রাম পাঠিয়েছিলেন অনশন ভাঙবার জন্য। তিনি তখন নোবেল লরিয়েট। টেলিগ্রামে রবীন্দ্রনাথ লেখেন: ..... রবীন্দ্রনাথ যখন বাংলা সাহিত্য জগতের কর্ণধার। তিনি নজরুলের প্রতিভাকে বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন। বাংলা সাহিত্য যে নজরুলের হাতে নূতন মোড় নিচ্ছে এবং সাহিত্যের ধারাও যে পাল্টে যাচ্ছে তা বুঝেই তিনি এই বিরল প্রতিভার বিকাশকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। নজরুলকে তাঁর লেখা 'বসন্ত নাটক' উৎসর্গ করা এই মনোভঙ্গির পরিচয় মনে করে।

নজরুলের সম্পাদিত 'ধূমকেতু'র প্রাকশকে তিনি অভিনন্দিত করে লেখেনঃ

কাজী নজরুল ইসলাম কল্যাণীয়েষু,-

আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু
আঁধারে বাঁধ সন্নিকেতু
দুদিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোঁর বিজয়কেতন!
অলক্ষণের তিলকরেখা
রাতের ভালে হোক্ না লেখা,
জানিয়ে দে রে চমক মেরে'
আছে যারা অর্ধচেতন!
– শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২৪শে শ্রাবণ, ১৩২৯

এই আশীর্বাণীর মধ্যেই ফুটে উঠেছে নজরুলের সামর্থের কথা। নজরুল বাংলা সাহিত্যকে নূতন আঙ্গিকে গড়ে তুলতে পারবেন–এমন বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায় যে নদী-চলতে চলতে বাঁক নেয় এবং এই বাঁক নেওয়ার সাথে সাথে তার গতিও বৃদ্ধি পায়। নদী তখন খরস্রোতা। নজরুলের ক্ষেত্রে এমনটি হয়েছিল। বাংলা সাহিত্য নূতন মোড় নিয়েছিল তাঁর হাতে। রবীন্দ্রনাথ নজরুলের আমরণ অনশনে শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন বিধায় তার জন্যে এই টেলিগ্রাম তিনি পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু ভুল ঠিকানায় চলে যাওয়াতে নজরুলের কাছে টেলিগ্রামটি যথাসময়ে পৌঁছুইনি।

নজরুল তাঁর নিজের মায়ের সঙ্গে দেখা করেন নি যখন তাঁর মা এসেছিলেন জেলে নজরুলকে অনশন ভাঙাতে। ইতোমধ্যে নজরুলের মা স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁর দেবর অর্থাৎ নজরুলের চাচাকে বিয়ে করেছেন। সৈনিক জীবন থেকে ফিরে এসে নজরুল চুরুলিয়া গিয়ে এ খবর জানতে পারেন। এই ঘটনা তাঁর মনকে দারণভাবে আঘাত করেছিল এবং সে কারণেই তিনি মায়ের সঙ্গে দেখা করেন নি। নজরুলের জীবন চরিত্র আলোচনা করলে দেখা যায় যে তিনি একজন হিন্দু নারী কুমিল্লার বিরজা সুন্দরীকে মায়ের আসনে বসিয়েছিলেন। তাঁর হাতে লেবুর রস খেয়ে নজরুল অনশন ভঙ্গ করেছিলেন। বিরাজ সুন্দরী দেবীল পরিবারে গিরিবালা দেবীর কন্যা প্রমীলা সেনগুপ্তের সঙ্গে নজরুলের বিয়ে হয়েছিল। এই বিয়েতে বিরাজ দেবী তাঁর স্বামীসহ অন্যেরা রাজী ছিলেন না। গিরিবালা দেবী প্রমিলার কিন্তু ইচ্ছার কারণে এই বিয়ে হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ যে হুগলীর সরকারি উকিল খান বাহাদুর মছারুল আনোয়ারের কন্যা ' মা ও মেয়ে' উপন্যাস খ্যাত মিসেস এম, রহমান নূর লাইব্রেরীর সত্ত্বাধিকারী মঈনউদ্দীন হোসায়েন এই বিয়েতে উদ্যোগ নেন এবং মঈনউদ্দীন হোসায়েন বিয়ের আক্দ পড়িয়েছিলেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে 'ধূমকেতু'র জন্যে নজরুলকে জেলে যেতে হয়েছিল। এই 'ধূমকেতু'তে তিনি তাঁর সাংবাদিকতার পরাকাষ্টা দেখিয়েছিলেন। নজরুলের ঘনিষ্ট বন্ধু পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় 'ধূমকেতু' সম্বন্ধে বলেনঃ

"বিক্রির সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলে, কাগজ বেরুবার আগেই হকার আগাম দাম দিয়ে যায়। কাগজ বেরুবার ক্ষণটুকু মোড়ে মোড়ে তরুণের জটলা করে দাঁড়িয়ে থাকে–হকার কতক্ষণে নিয়ে আসে 'ধূমকেতু'র বাণ্ডিল। তারপর হুড়োতুড়ি কাড়াকাড়িতে কয়েক মিনিটের মধ্যে তা নিঃশেষ হয়ে যায়। এক কপি কাগজ নিয়ে চায়ের দোকানে ঘন্টার পর ঘন্টা গরম বক্তৃতা চলে। ছাত্র হোস্টেলে, রোয়াকে, বৈঠকখানায় তার পরদিন পর্যন্ত একমাত্র আলোচ্য বিষয় থাকে– 'ধূমকেতু'। জাতির অচলায়তন মনকে সহর্নিশ এমন করে ধাক্কা মেরে বলে 'ধূমকেতু' যে রাজশক্তি প্রমাদগণে। 'ধূমকেতু'র আড্ডায় সারাদিন লোকের পর লোক আসে। কেউ পরিচিতি হতে, কেউ আদর্শের ঐক্য জ্ঞাপন

করতে। কেউবা প্রেরণা লাভ করতে। মাটির ভাড়ে করে চা সবার জন্যে তৈরি। (পবিত্র গঙ্গেপাধ্যায় 'ধূমকেতু'র নজরুল' কবি নজরুল, পৃ. ৩৬-৩৭)"।

নজরুলের 'ধূমকেতু' সম্বন্ধে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বলেনঃ "সপ্তাহান্তে বিকেল বেলা আরো অনেকের সঙ্গে জগুবাবুর বাজারের মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকি, হকার কতক্ষণে 'ধূমকেতু'র বাণ্ডিল নিয়ে আসে। হুড়োতুড়ি কাড়াকাড়ি পড়ে যায় কাগজের জন্যে। কালির বদলে রডে ডুবিয়ে লেখা সেই সব সম্পাদকীয় প্রবন্ধ। সঙ্গে 'ত্রিশুলে'র আলোচনা। শুনেছি স্বদেশী যুগের 'সন্ধ্যা'তে ব্রবাহ্মব এমনি ভাষাতেই লিখতেন। সে কী দশা, কী দাহ। একবার পড়ে বা শুধু একজনকে পড়িয়ে শান্ত করবার মত সে লেখা নয়। যেমন গদ্য তেমনি কবিতা। সব ডাঙার গান, প্রলয়বিলয়ের মঙ্গলাচরণ" (অচিন্ত কুমার সেনগুপ্ত কল্লোল যুগ, পৃ. ৪৬-৪৭)

আমরা দেখেছি স্বদেশের স্বাধীনতার জন্যে নজরুল জীবনবাজি রেখে 'ধূমকেতু' প্রকাশ করেছেন এবং সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এক বৈপ্লাবিক পরিবর্তন এনেছিলেন। 'ধূমকেতু' অষ্টম সংখ্যা (২৬ ভাদ্র, ১৩২৯ সাল) নজরুল 'বিষবাণী' প্রবন্ধে লেখেন "মাভৈঃ! মাভৈঃ!! ভয় নাই, ভয় নাই–ওগো আমার বিষমুখ অগ্নি-নাগ-নাগিনী-পুঞ্জ!

দোলা দাও, দোলা দাও- তোমাদের কুটিল ফণায় ফণায়। তোমাদের যুগ-যুগ সঞ্চিত কালবিষ আপন আপন সর্বাঙ্গে জড়িয়ে ফেল। তোমাদের বিভূতিবরণ অঙ্গ কাচাবষের গাঢ় সবুজরাগে রে ঙে উঠুক। বিষ সঞ্জয় কর–হে আমার তিক্ত চিত ডুজঙ্গ তরুণ দল! তোমাদের ধরবে কে? মারবে কে?

এস আমার শনি হারা কাল ফণির দল, তোমাদের প্রেমের কেতকী কুঞ্জ ছেড়ে, অন্ধকার বিবর ত্যাগ করে। এস, মায়ের আমার শ্মশান–শায়িত আঘাত জর্জরিত মৃত্যু–শয্যা পার্শ্বে। হয় মৃত-সঞ্জীবণী আন, নয় ভাল করে বিতাগ্নি জ্বলে উঠুক।

বল মাভৈঃ! মাভৈ।!! বল–

হর হর শঙ্কর–
বল, জয় ভৈরব জয় শঙ্কর
জয় জয় প্রলয়কার
শঙ্কর! শঙ্কর!"

আমরা সহজেই বুঝতে পারি নজরুল তাঁর লেখনীতে হিন্দু সমাজের তরুণদের আহ্বান করেছিলেন। ক্ষুধিরামের মতো তরুণেরা নজরুলের লেখণীতে দেখেছিল এক মুক্ত ভারতের প্রতিচ্ছবি। নজরুলের ভাষা কখনও হিন্দুয়ানী কখনও মুসলমানী হয়েছে স্ব-স্ব সম্প্রদায়ে বিপ্লবের দীক্ষা নিতে। এখানে তার ভাষা অসাধারণ শক্তিশালী। নজরুলের একমাত্র কামনা ছিল, এদেশ থেকে ইংরেজকে যেমন করে হোক উৎখাত করতে হবে।

১৩২৯ সালের ১৪ই কার্তিক 'ধূমকেতু'তে নজরুল লেখনেঃ 'এখন দেশে সেই লোকের দরকার যে সেবক দেশ-সৈনিক হতে পারবে। রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দু, প্রফুল্ল বাংলার দেবতা, তাঁদের পুজার জন্যে বাংলার চোখের জল চিরনিবেদিত থাকবে। কিন্তু সেনাপতি কই? সৈনিক কোথায়? কোথায় আঘাতের দেবতা, প্রলয়ের মহারুদ্র? সে পুরুষ এসেছিল বিবেকানন্দ, সে সেনাপতির পৌরুষদীপ্ত গর্জে উঠেছিল বিবেকানন্দের কণ্ঠে।"

'ধূমকেতু'র ১৯ সংখ্যঅ (১৭ কার্তিক ১৩২৯) নজরুল ঘুমন্ত জাতিকে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অকুতোভয় চিত্তে জেগে উঠতে আহ্বান জানাল। তিনি সম্পদকীয় প্রবন্ধে লেখেনঃ

"ওঠ ওগো আমার নির্জীব ঘুমন্ত পতাকাবাহী বীর সৈনিকদল। ওঠ, তোমাদের ডাক পড়েছে–রণদুন্দভি বনভেরী বেজে উঠেছে। তোমার বিজয় নিশান তুলে ধর। উড়িয়ে দাও উচু করে। ভুলে দাও যাতে সে নিশান আকাশ ভেদ করে ওঠে। পুড়িয়ে ফেল ঐ প্রাসাদের ওপর যে নিশান বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে তোমাদের উপর প্রভুত্ব ঘোষণা করছে।....

আমাদের বিজয়–পতাকা তুলে ধরবার জন্য এসো সৈনিক। পতাকার রঙ হবে লাল, তাকে রঙ করতে হবে খুন দিয়ে। বল আমরা পেছাব না। বল আমরা হিংসাশাবক, আমরা খুন দেখে ভয় করিনা। আমরা খুন নিয়ে খেলা করি, খুন নিয়ে কাপড় ছেপই, খুন নিয়ে নিশান রাঙায়। বল আমি আমি পুরুষোত্তম জয়া! বল মাভৈঃ মাভৈঃ জয় সত্যের জয়।"

'ধূমকেতু'র ২০ সংখ্যা (২১ কার্তিক ১৩২৯) নজরুল সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলেনঃ

"ভিক্ষা দাও! ওগো পুরবাসী ভিক্ষা দাও। তোমাদর একটি সোনার ছেলে ভিক্ষা দাও। আমাদের এমন একটি ছেলে দাও যে বলতে আমি ঘরের নই, পরের। আমি আমার নই দেশের।...

তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ নাই যে বলতে পারে আমি আছি। সব মরে গেলেও আমি বেঁচে আছি। যতক্ষণ রক্তধারা বয়ে যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তা দেশের জন্য যাও কোরব। ওগো তরুণ ভিক্ষা দাও তোমার কাঁচা প্রাণ ভিক্ষা দাও।"

নজরুলের 'ধূমকেতু' পত্রিকার সংবাদ ও সম্পাদকীয় বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় দেশের জন্য তাঁর যে আবেগ ছিল তা তিনি সাংবাদি হিসেবে একটি ঘুমন্ত জাতিকে জাগাবার জন্য ব্যয় করেছে। এখানে তার ভাষা কাব্যময়। এটার প্রয়োজন ছিল। তিনি কাব্যের মধ্যে অগ্নিকে স্থাপন করেছেন। ফলে তাঁর ভাষা হয়েছে অগ্নিময়। এখানে 'মেধা' খুঁজতে পাওয়া বাতুলতা। কিছু কিন্তু মানুষ নজরুলের এই আবেগ–উচ্ছ্বাসকে অনেকে পাগলামী বলে উল্লেখ করেছেন। তারা নজরুলকে আদৌ বোঝেননি। নজরুল

এবং তাঁর 'ধূমকেতু' মুষড়ে পড়া স্বাধীনতা কাজী যুবকদের যাঁরা ইংরেজদের কাছে সন্ত্রাসী বলে চিতি তাঁদের প্রেরণার উৎস হয়েছিলেন।

'ধূমকেতু' পত্রিকার আবির্ভাব ও তার সাংবাদিকতাকে অভিনন্দন জানিয়ে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ৩০ আগস্ট 'অমৃতবাজার' পত্রিকায় লেখা হয়ঃ

"Dhumketu" We cordially welcome the advent of our new Bengali contemporary the "Dhumketu" a bi-weekly edited by Habider Kazi Nazrul islam published from 32, College street, Calcutta. The editor has already made his mark as a powerful poet and some of his recent poems, particularly the `Bidrohi' are among the most well known in the Bengali literature. The articles from the editorial pen in the 'Dhumketu' fully sustain the reputation of the soldier poet and the collections he has been able to make one in tune with the fine and energy of his own writings. There is something novel, something enthrolling in this new venture. We hope, the 'Dhumketu' or comet will not simply be an emblem of distribution in the hands of the soldier- poet but will creesate something that is beautiful something that is abiding and holy.'

নিঃসন্দেহে, নজরুলের 'ধূমকেতু' সেদিনের অমৃত বাজার পত্রিকার আশংকাকে তিরোহিত করে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য 'স্থায়ী ও পবিত্র' কর্মকাণ্ডকে বাস্তবে রূপ দিতে পেরেছিল। বস্তুত, অমৃতবাজার পত্রিকা সেদিন সৈনিক-কবি নজরুলকে সাংবাদিক জগতের 'অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র' হিসেবে গ্রহণ করেছিল। সাংবাদিকতায় তাঁর অবদান কোনদিনই ম্লান হবেনা। ভারতের স্বাধীনতাকামী এমন 'লড়াকু সাংবাদিক' ভারতের মাটিতে আর কখনও জন্ম নেয়নি এবং ভবিষ্যতে জন্ম নেবে কিনা সন্দেহ। 'ধূমকেতু' পত্রিকা পরবর্তীতে ৭নং প্রতাপ চাটুজ্যে লেন থেকে প্রকাশিত হতে থাকে।

নজরুলের সাংবাদিকতা সম্পর্কে ড. সুশীলকুমারগুপ্ত বলেনঃ

সংবাদের শিরোনাম বা হেডি রচনাও সংবাদ সংক্ষেপ করার যে ক্ষমতা নজরুল নবযুগ সম্পাদনা করার ফলে দেখান, তারই পরিণতরূপ ব্যক্ত হয় 'ধূমকেতু'তে। সংবাদ পরিবেশন ও তার হেডিং প্রণয়নে 'ধূমকেতু'তে নজরুলের আশ্বর্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর দেখতে পাওয়া যায়। কড়ামিঠে টিপ্পনি ও সম্ভব্য এবং মাঝে মাঝে রঙ্গব্যঙ্গের ছোট ছোট কবিতা ও প্যারোডির ব্যবহারে সংবাদগুলি হত যেমন উপভোগ্য তেমনি মর্মস্পর্শী। কথ্যভাষায় আরবী ফারাসি দেশী শব্দের নিপুন প্রয়োগে সংবাদ হতো তীক্ষ্ম ও প্রাণবন্ত" (নজরুল চরিত মানস, কলকাতা ১৩৯৫ পৃ. ৩৩৬)

প্রকৃত অর্থে নজরুল কবি হিসেবেও যেমন জাত কবি ছিলেন, তেমনি ছিলেন গানে। সাংবাদিকতায় তাঁর সমকক্ষ তখনকার দিনে তেমন কেউ ছিলেননা। তাঁর সংবাদ পরিবেশনা এবং শিরোনাম ছিল চিত্তাকার্ষক এবং সৃষ্টিশীল।

ড. সুশীলকুমার গুপ্ত নজরুলের সৃষ্টিশীল সংবাদ পরিবেশনা সম্বন্ধে বলেনঃ

"সংবাদের মধ্যে ব্যঙ্গকবিতা বা প্যারডিগুলি সংবাদকে সরস অথচ তীব্র করত। দেশের সংবাদ স্তম্ভে বহুদিন ওকালতি স্থগিত রাখার পর পণ্ডিত মদন মোহন মালব্যের সরদার মাহতাব সিংহের মামলা নিয়ে আদালতে হাজির হওয়ার সংবাদের শেষে লেখা প্যারডিটি অত্যন্ত চিত্তহারী।

দেশ দেশগণ্ডিত করি মন্দ্রিত তব ভেরীঃ
আসিল যত উকীলবৃন্দ আসন তব ঘেরি।
যতীন আগত ঐ
জয়কারাগত ঐ
মদন মোহন কই
সে কি রহিল চুপটি আজকে সবজন পশ্চাতে,
লউক ধুচুনি মামলা ভার সব জনার সাথে"

হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুরের চাকরী থেকে স্যার আলী ইমাম ইস্তফা দিয়েছেন, এই সংবাদের সমণ্ডিতে কবিতা–

"যখন পিরীতি ছিল
তখন বেসেছ ভাল
আগে শুয়েছি তেঁতুল পাতে
কুলায় না আর মানপাতে।"

সংবাদের শিরোনাম 'ইস তোফা।' (সুশীলকুমার গুপ্ত, পৃ. ৩৩৭)

বস্তুত, নজরুল প্রচলিত নিয়মে সংবাদপত্রের সংবাদ পরিবেশন করেন নি। 'ধূমকেতু' পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ ধোলাই। নজরুল এ কাজটি ভালভাবে করেছেন। নিজের কয়েকটি সংবাদ পরিবেশনে নজরুল ব্যাঙ্গকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যক্ত করেছিলেন। যেমনঃ

'ধূমকেতু'র ১২ সংখ্যায় (৯ আশ্বিন ১৩২৯) স্যার জন কার-এর গভর্ণর হওয়ার সংবাদের হেডিং ছিল এমন 'গোবর-নর প্রসবিণী বঙ্গমাতা।' এরপর সংবাদ লেখা হয়েছে নিবোক্তভাবেঃ

"বঙ্গমাতা কেবল রত্ন প্রসবিণী নন–গবর্ণর প্রসবিণীও বটে। ইতিপূর্বে বঙ্গমাতা দুইজন গবর্ণর প্রসব করেছেন, এক লর্ড সিংহ, ত দ্বিতীয় স্যার হ্যানরী হুইলার। এবার আর একজন গবর্ণর প্রসব করলেন–স্যার জনকার। ইনি বাংলার খাস দপ্তরের সদস্য ছিলেন–এখন আসামের গবর্ণর নিযুক্ত হলেন।"

রবীন্দ্রনাথকেও নজরুল ছাড়েন নি। যেমন রবীন্দ্রনাথ একবার ভারতের নানা স্থান ভ্রমণ করলে নজরুল তাঁর এই ভ্রমণ সম্বন্ধে টাইটেল লেখেনঃ 'বাউল কবির টহল' এমন

অনেক মাজাদার শিরোনামে 'ধূমকেতু'র প্রকাশ যেমন হতো, তেমনি পাঠকেরা এসব তেডিং দেখে মজা পেতেন। অন্য কোন কাগজের শিরোনামে এমন ব্যাঙ্গরসের প্রকাশ কেউ কখনও দেখেনি। ফলে নজরুলের কালে 'ধূমকেতু' ছিল চোখে পড়ার মতো। 'ধূমকেতু'তে সংবাদ পরিবেশনা হতো তিনটি ভাগে। (১) দেশের খবর (২) পরদেশী চাঞ্জু (৩) মুসলিম জাহান।

এই প্রসঙ্গে দেশের খবর অংশের কিছু সংবাদ শিরোনাম দেখলে বোঝা যাবে নজরুল তাঁর সাংবাদিকতায় নতুনত্ব এবং চমক এনেছিলেন। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ১২ সেপ্টেম্বর নজরুল মহতবাজার পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদকের মৃত্যুতে নজরুল 'ধূমকেতু' পত্রিকায় শিরোনাম দিলেন "মর্ত্যের মতিলাল স্বর্গে।" এমনিভাবে সে সময় বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কয়েকজন তৎকালীন ইংরেজ সরকারের চর বলে ধরা পড়ার পর 'ধূমকেতু'তে শিরোনাম! 'বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা, ঘর–শত্রু বিভীষণ। মহররম নিয়ে মারামারি হওয়ায় নজরুল লিখলেন! দহরম মহরম'। গুরুকা বাগ সরেজমিনে ইংরেজ সরকারের তদন্তকে 'নখদন্তহীন তদন্ত' বলে 'ধূমকেতু'তে শিরোনাম হয়েছিল।

মুসলিম জাহান স্তম্ভে তুরস্কের মোস্তফা কামাল পাশার গ্রীকযুদ্ধে জয়লাভ করায় 'ধূমকেতু'তে শিরোনাম এলোঃ

সাবাস কামাল মোস্তফা
তোরেই দেখছি মোচ তোফা
খুব কষে ভাই গোস্ত খা
বাধ জালিমের হস্ত পা।'

'ধূমকেতু'তে মজার মজার সংবাদ ও তাঁর শিরোনাম খুব আকর্ষণীয় ছিল। এ প্রসঙ্গে জনৈক ইংরেজ জন বায়ওয়াইজ জউথভয়েই অধিক রাতে ঘড়ি দেখতে গিয়ে দেশলাই জ্বালাতে গিয়ে দুর্ভাগ্যক্রমে তার দাঁড়িতে আগুন লেগে যায় এবং ক্রমে সে আগুন জামায় এবং বিছানায় ধরে গেলে সে পুড়ে মারা যায। নজরুল 'ধূমকেতু'তে লিখলেনঃ

দাড়িতে আগুন লেগে অক্কা
টরে টক্কা টরে টক্কা

এরপর টিকিতে আগুন এমন শিরোনামে লেখা হলঃ

কি আনন্দ কি আনন্দ কি আনন্দ
পুড়ে দাড়ি পুড়ে টিকি ছুটে গন্ধ
কি আনন্দ! কি আনন্দ!

পাঠক বুঝতেই পারছেন, 'ধূমকেতু' সে সময় কেন এত জনপ্রিয় ছিল।

'ধূমকেতু' পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল গণজাগরণ। এই গণজাগরণ এক দিকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে অপরিদেক বিত্তবান ধনিক শ্রেণির শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে। দেশের স্বাধীনতার জন্য এমনভাবে কোন পত্রিকা লেখে নি। নজরুলের কলম ছিল সেখানে দুর্বার। দেশের মুক্তির গণবিপ্লব বোধ করি নজরুলের সমকালে অপরিহার্য ছিল। এসময়ে তরুণদের একাংশ দেশের মুক্তির জন্য সাম্রাজ্যবাদকে বেছে নিয়েছিলেন। 'ধূমকেতু' ছিল তাদের প্রেরণার উৎস।

রাজনৈতিক ভাবনায় 'ধূমকেতু' নিরপেক্ষ ভূমিকা নিয়েছিল। এ সম্পর্কে 'ধূমকেতু'র বক্তব্য ছিল স্পষ্ট।

"আমরা কোন দলেই নাই, আমরা সবারই বসুশুল আছি এবং থাকবো, তাইই আমাদের বিশেষত্ব ও গৌরব। সুতরাং সবারই কথা শুনবো ও সবাইকে শোনাব। তার ভালমন্দ আমাদের কাঁচা মনে কেমন ছাপ কখন দেয়, তাও প্রকাশ করবো। কেবল বুরোক্রেসীর কোনো উপদেশ শুনবো না, অত্যাচারে দমবোনা, দয়ার সাগরে ভেসে যাব না। কারণ স্বদেশী-বিদেশী কোনো ব্যুরোক্রেসীই স্বাধীনতা দেয়না। একজন্য ঐসব ক্রেসী-ফ্রেসীর সঙ্গে আমাদের কোনো রফাও নেই, ওদের উপর বিশ্বাসও নেই।' ('ধূমকেতু' ৩১ সংখ্যা)

দেশের স্বাধীনতার জন্য নজরুল কাব্যে এবং গানে যে লড়াই করেছেন এ জন্য নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর গানকে ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গ্রহণ করতে সুপারিশ করেছিলেন তাঁর বক্তব্যে। বস্তুত, নজরুল ছিলেন প্রকৃত অর্থে বৃটিশ ভারতের আপামর জনসাধারণের প্রাণের জাতীয় কবি রবীন্দ্রনাথ নিজেই বুর্জোয়া ছিলেন এবং সে কারণে বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি নোবেল পুরস্কারে দুষিত হয়েছেন। নজরুলকে কখনও এই প্রতিষ্ঠান স্বীকৃতি দেবেনা, দেয়ওনি।

'ধূমকেতু' পত্রিকাকে নিয়ে আমার এই আলোচনা সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে নজরুলের অসামান্য অবদানকে থুলে ধরা। ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে'ধূমকেতু' মুখ্যত অগ্নিবর্ষী হয়েছিল–তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তৎকালীন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের দুঃসহ দমন নীতিকেও নজরুল নানাভাবে ব্যঙ্গ করেছেন।

'ধূমকেতু' সংবাদপত্র হলেও তার সংবাদ পরিবেশনা যে সাহিত্য ভাবনা পুষ্ট ছিল এটা সকলেই স্বীকার করেছেন। 'ধূমকেতু'র সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলো ছিল সাহিত্যের এক অসামান্য সম্পদ সংবাদপত্রের গদ্য ভাষাও যে কাব্যরসমণ্ডিত হতে পারে নজরুলের পূর্বে এবং পরে কেউই তা আর পারেন নি। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত দুঃখ করে তাই বলেছেনঃ 'ধূমকেতু'র সে সব সম্পাদকীয় প্রবন্ধ সংকলিত থাকলে বাংলা সাহিত্যের একটা স্থায়ী উপকার হত। অন্ততঃ সাক্ষ থাকত বাংলা গদ্য কতটা কাব্যগুণান্বিত হতে পারে, 'প্রসন্ন গম্বীর পদা সরস্বতী' কি করে বিনিষ্ক্রান্তাসি ধারিণী' সংহার-কত্রী সহকারী হতে পারে। প্রসাদরম্য ললিত ভাষায় কি করে উচ্চারিত হতে পারে অগ্নিগর্ভ–অঙ্গীকার।"

একটা প্রবন্ধের কথা এখনও মনে আছে–নাম, "ম্যয় ভু যা হু" মহাকালী ক্ষুধার্ত হয়ে নরমুণ্ডের লোভে শশ্মানে বেরিয়েছেন তারই একটা ঘোরদর্শন বর্ণনা। বোধ হয় সে সংখ্যাটি কালীপূজার সন্ধ্যায় বেরিয়েছিল। কালীপূজার দিন সাধারণ দৈনিক বা সাপ্তাহিক কাগজে যেমাজ্জাল প্রবন্ধ বেরোয়–মুখস্ত করা কতকগুলো সমাসবন্ধ কথা–এ সে জাতের লেখা নয়। দীপান্বিতার রাত্রির পরেই এ দীপ নিভে যায় না। বাংলাদেশের চিরকালীন জীবনের রক্তে এর দ্যুতি জ্বলতে থাকে।" (কল্লোলযুগ, পৃ. ২৮)

অচিন্ত্যকুমার আরো লিখলেনঃ 'ধূমকেতু'তে একটা কবিতা পাঠিয়ে দিলাম। অর্থাৎ একটা সাঁকো ফেলাম নজরুলকে গিয়ে ধরার জন্যে। সেই কবিতাটা ঠিক পরবর্তী সংখ্যায় বেরুলোনা। অন্যুসাহিত হবার কথা, কিন্তু আমার স্পর্ধা হল নজরুল ইসলামের কাছে গিয়ে মুখোমুখি জবাবদিহি নিতে হবে। গেলাম তাই একদি দুপুরবেলা। রঙিন লুঙ্গি পরনে, গায়ে আট গেঞ্জি–অসম্পাদকীয় বেশে নজরুল বসে আছে থক্তপোশে–চারিদিকে একটা অন্তরঙ্গতার আবহাওয়া ছড়িয়ে। অগ্নিবীণার প্রথম সংস্কারণে নজরুলের একটা ফটো ছাপা হয়েছিল, সেটাই বড় বেশি কবি কবি ভাব–এখন চোখের সামনে একটা মানুষ দেখলাম, স্পষ্ট, সতেজ প্রাণপূর্ণ পুরুষ। বললাম–আমার কবিতার কি হল? নজরুল চোখ তুলে চাইলঃ কোন কবিতা। বললাম–আপনার কবিতা যখন 'বিদ্রোহী' আমার কবিতা 'উচ্ছৃঙ্খল'। হাহাহা করে নজরুল হেসে উঠল। বললে–আপনি মনোনীত হয়েছেন। কবিতাটি ছাপা হয়েছিল কিনা জানিনা। হয়তো হয়েছিল, কিংবা হয়তো তার পরেই নজরুলকে ধরে নিয়ে গেল পুলিশে। কিন্তু তার সেই কথাটা মনের মধ্যে ছাপা হয়ে রইল? আপনি মনোনীত হয়েছেন।"

নজরুলের 'ধূমকেতু' বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেদিন বাঙালী মাত্রই শোকাভূত হয়েছিলেন। এমন করে কোন পত্রিকা দেশের কথা, দশের কথা, স্বাধীনতার সংগ্রামের কথা কখনও বলেনি।

অতঃপর ১৩৩৮ সালের ৫ই ভাদ্র (২২শে আগস্ট ১৯৩১) 'ধূমকেতু' পুণরায় প্রকাশিত হয়। এ সময় এর সম্পাদক ছিলেন কৃনেন্দু নারায়ণ ভৌমিক। নজরুল এই সংখ্যা 'ধূমকেতু'র আদি উদয় স্মৃতি শীর্ষক একটি স্মৃতিকথা লেখেন।

" প্রায় দশ বছর আগের কথা। স্মৃতি....। সে কথা হয়ত আজ দুলিমলিন হইয়া গিয়াছে। ১৩২৯ সাল প্রাবণ মাস–'তিমির ভালে অলক্ষণের তিল রেখা'র মতোই 'ধূমকেতু'র প্রথম উদয় হয়। তখন নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের সক্রিয় ধুলই উৎসব পুরোমাত্রায় জমিয়া উঠিয়াছে। কারাগারে লোক আর ধরে না। ধরা দিতে গেলে পুলিশে ধরে না, 'বন্দেমাতরম' 'মহাত্মা গান্ধী কী জয়? রব আমাখে বাতাসে আর ধরে না। মার খাইয়া পিঠ শিলা হইয়া গিয়াছে, মারিয়া মারিয়া পুলিশের হাতে খিল ধরিয়া গিয়াছে। মার খাইবার সে কি অদম্য উৎসাহ। পুলিশের পায়ে ধরিলেও সে আর মারে না, পালাইয়া যায়।

ইহারই মাঝে সর্ব প্রথম প্রলয়েশ ক্ষেপিয়া উঠিলেন। দেশের নেতা, অপনেতা, হবু-নেতা সকলে যখন বড় বড় দূরবীন লাগাইয়া স্ব-রাজের উধয়–তাঁরা খুঁজিতেছিলেন তখন আমার উপর শিব ঠাকুরের আদেশ হইল––এই আনন্দ রজনীকে শঙ্কাকুল করিয়া তুলিতে! আমার হাতে তিনি তুলিয়া দিলেন– 'ধূমকেতু'র ভয়াল নিশান। স্বরাজ প্রত্যাশী দল নিন্দা করিলেন, গালি দিলেন। এই ধূলি তৎক্ষিপ্ত হইল, বই লোস্ট নিক্ষেপিত হইল। 'ধূমকেতু'কে তাহা স্পর্শ করিতে পারিল না।

আমার ভয় ছিল না; আমার পিছনে ছিলেন বিপুল প্রমথ বাহিনীসহ দেবাদিদের প্রলয়নাথ। 'ধূমকেতু' কল্যাণ আনিয়াছিল কিনা জানিনা, সে অকল্যাণের প্রতীক হইয়াই আসিয়াছিল। 'ধূমকেতু' তাহা দেরি বাণী লইয়া আসিয়াছিল–যাহাদের গৃহে আশ্রয় দিতে ভয় পায়, গ্রহণ বনে বাঘ যহাদের পথ দেখায়, ফণি তাহার মাথার মণি জ্বালাইয়া যাহাদের পথের দিশারী হয়, পিতামাতার স্নেহ যাহাদের দেখিয়া ভয়ে তুহিন-শীতল হইয়া যায়।

রুদ্রদেব আর্শীবাদ করিলেন, আমার কারাশুদ্ধি হইয়া গেল। প্রয়োজনের আহবানে নটনাথের আদেশে আমি নিশান-বর্দার হইয়াছিলাম, তাহারি আদেশে 'ধূমকেতু' অন্ধ বিমান পথে হারাইয়া গিয়াছে।

আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ ভৌমিক আবার 'ধূমকেতু'কে আহবান করিতেছে। কোন রূপে এই 'ধূমকেতু'র উদয় হইতে জানিনা তবু আশা আছে–যে ধূজটির জটাজুট 'ধূমকেতু' ময়ুরপাখা, সেই ধূজটির রুদ্র আশীর্বাদ সে লাভ করিবে, এ যুগের প্রলয়েশ তাহাকে নবপথে চালিত করিবেন। আমি ইহার ফণিশিখায় সমি'ব যোগাইব মাত্র।'

নজরুল পুরোপুরিভাবে এই পত্রিকার সঙ্গে আর যুক্ত থাকেননি। পত্রিকাটিও আর তেমন জনপ্রিয় থাকেনি। ক্রমে তা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়।

বস্তুত, নজরুল পেশা হিসেবে সাংবাদিকতাকে গ্রহণ করেছিলেন এবং পাশাপাশি কবিতা গান, এবং ছোটগল্প, উপন্যাস এবং রস রচনা লিখেছেন। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে নজরুল অন্যান্য সাংবাদিক থেকে ব্যতিক্রমী ছিলেন। তিনি সংবাদপত্রর শিরোনামে কবিতা ব্যবহার করতেন। তবে এসব কবিতায় তাঁর বুদ্ধি, চাতুর্য এবং ব্যঙ্গ রস থাকতো। এর পেছনে পাঠককে আকর্ষণ করাই উদ্দেশ্য ছিল। বলতে কি, এক্ষেত্রে তিনি এবং তাঁর সংবাদপত্র সমকালে মানুষের মন জয় করেছিল।

প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে বলেন' "নজরুল প্রধান সম্পাদক হিসাবে সম্পাদকীয় স্তম্ভে যে সকল প্রবন্ধ, কবিতা লিখতেন তার শিরোনামা দেখে বাংলার পাঠকমণ্ডলী পত্রিকা পড়বার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকত। পত্রিকা প্রকাশ হলে কলকাতা মহানগরীতে, মফস্বল শহরে ও গ্রাম-গ্রামান্তরে সমাজ পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে ছেলে বুড়োর দল লুফে নেবার জন্যে হাতাহাতি মাতামাতির সঙ্গে হৈ হুল্লোড় করত। কাগজ

পেলেই পাঠকরা রাস্তার মোড়ে, বাড়ির বকে, গাছের তলায় বসে একজন উৎসাহের সঙ্গে পড়ত আর অন্যান্য শ্রোতারা শুনত।

নজরুল গুরুত্বপূর্ণ সংবাদকে মানুষের মনে ছাপ লাগিয়ে দেবার জন্য প্রচলিত কথা, প্রবাদবাক্য, মা-দিদি মাদের মুখে যে সব কথা শ্লোক হয়ে ঘরে ঘরে নেচে বেড়াত, তা সংগ্রহ করে কবিতার বই চুটকি দিয়ে লেখার পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন বলেই এত হৃদয় গ্রাহী হয়েছিল দেশের পাঠক-পাঠিকাদের।

সম্পাদকীয় স্তম্ভে দ্বিতীয় পর্যায়ে দৈনিক নবযুগে সংবাদকে বা মতবাদকে পুরো একটা দীর্ঘ কবিতায় লিখতেন। যেমন 'অগ্রনায়ক', 'রাজায় বিমান উড়াই নিশান', 'ঈশান কোণের মেঘে', 'ভয় করিওনা হে মাবত্মা', 'আগ্নেয়গিরি বাংলার যৌবন', 'কোলাতে ধলাতে লেগেছে এবার মন্দ-মধুর হাওয়া; দেখি নাই কভু দেখি নাই ওগো এমন ডিনার খাওয়া।' (শাহাবুদ্দীন আহমদ, নজরুলের সাংবাদিকতা, 'নজরুল জীবন ও কবিতায়' পৃষ্ঠা ২১৫-২১৬)

'ধূমকেতু' পত্রিকায় সম্পাদকীয় স্তম্ভে ৩২টি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। 'ধূমকেতু' পত্রিকায় সম্পাদকের পরিবর্তে .. শব্দটি তিনি ব্যবহার করতেন। এস. এম. লুৎফর রহমান তাঁর 'ধূমকেতু' ও তার সারথি গ্রন্থে এ সব প্রবন্ধ এবং অন্যান্য ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন।

নজরুল অতঃপর ১৯২৫ সালে 'লাঙল' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি সাপ্তাহিক ছিল। ১৯২৫ সালে গঠিত ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত লেবার স্বরাজ পার্টির মুখপাত্র হিসেবে লাঙল প্রকাশিত হয়। কলকাতার ৩৭নং হ্যারিসন রোড থেকে সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসেবে 'লাঙ্গল' প্রকাশিত হতো। নজরুল মে মাস এই পত্রিকার প্রধান পরিচালক ছিলেন। সম্পাদক হিসেবে নজরুলের .. জীবনের বন্ধু ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের নাম থাকতো। 'লাঙ্গল' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় নজরুলের 'সাম্যবাদী' প্রকাশিত হয়েছিল। লাঙ্গলের দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯২৬ সালের ১লা জানুয়ারীতে। এই সংখ্যায় প্রকাশিত হয় নজরুলের 'কৃষকের গান'। তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশ পায় ১৯২৬ সালের ৭ই জানুয়ারী। এই সংখ্যায় নজরুলের 'সব্যসাচী' প্রকাশ পেয়েছিল। পরবর্তীকালে 'লাঙ্গল' পত্রিকার নাম গণবাণী রাখা হয়েছিল।